পরিবর্তন

১৬ মে ১৯৮০



রবীন্দ্রনাথের গান কতটা রবীন্দ্রসঙ্গীত ?



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ক্যান ঃ সৌম্য ভৌমিক

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


এক-চক্ষু জলদস্যু
মূল কাহিনী : রবিদাস সাহারায়
চিত্র কাহিনী : অলোক দত্ত
শিল্পী : পোলারিস
১৬
ছোকরা এখনও ভেবে দেখ ।
বাবাকে যে হত্যা করেছে তার সঙ্গে কিছুতেই হাত মেলাব না । পারলে প্রতিশোধ নেব ।
প্রতিশোধ ! হাঃ হাঃ হাঃ
নেড ক্যাপ্টেনের দিকে থুতু ছিটিয়ে দিল ।
ক্যাপ্টেন রেগে ওকে একটা ঘুঁষি মারল ।
রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে চিৎকার করে উঠলো
একে নিয়ে যাও ।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষের পরবর্তী বিশ বছরও কেটে গেল, কিন্তু আমাদের রবীন্দ্রভাবনায় কোন সুস্থ ভারসাম্য ও যথার্থ বিচারবুদ্ধি আজও দেখা গেল না। এটা পরিতাপের বিষয়। আজও একই রকম উদাত্ত অন্ধ রবীন্দ্রভক্তির উচ্ছ্বাস ও অযৌক্তিক রবীন্দ্রবিদ্বেষের অমীমাংসিত বাতাবরণ।

বছরে একবার কি দুবার রবীন্দ্রবন্দনা করে আমরা সাংস্কৃতিক দায় মেটাই। রবীন্দ্রনাথও কি তাহলে আমাদের বাৎসরিক ইনকামট্যাক্স রিটারন জমা দেবার মত ক্লান্তিকর কৃত্য অথবা পিতৃতর্পণের মত অনিবারণীয় রিচুয়াল হয়ে উঠলেন? ভাবতে কষ্ট হয়, নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও শিল্পসাধনার কোন ভাবসম্মিলন হল না। রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক উদার মানসিকতা কোন দামই পেল না অন্ধ প্রাদেশিকতাবাদীদের অসুস্থ ক্রিয়াকলাপে। দেশের সরকার রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানালেন আজও সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে অচ্ছুৎ রেখে এবং শিক্ষাক্রমে বাংলা ভাষাকে ঐচ্ছিক পাঠ্য করে। তাঁদের রবীন্দ্রভক্তি সোচ্চার হয় স্ব-পরিকল্পিত মূর্তি স্থাপনের উচ্ছ্বাসে এবং মুদ্রাস্ফীত বাজারদরের সঙ্গে সংগতি রেখে রবীন্দ্ররচনাবলীর মূল্য নির্ধারণে।

অথচ এই সেই রবীন্দ্রনাথের ধ্যানের দেশ, যার জাতীয় সংগীতটি তাঁর লেখা। যার শ্যামলবরণ কোমল মূর্তিটি আমাদের মর্মে আঁকতে চেয়েছিলেন। যে দেশের গ্রামীণ অকৃত্রিমতা থেকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন লোকগীতের সুর, পল্লী সংগঠনে ছিলেন সদা সক্রিয়, জাতীয় সংকটে দিয়েছিলেন নেতৃত্ব। আজ সারা দেশে রবীন্দ্র ঐতিহ্যকে বিদায় দেবার যে সকরুণ আয়োজন চলছে তার জন্য আমাদের শোচনাও আছে কি?

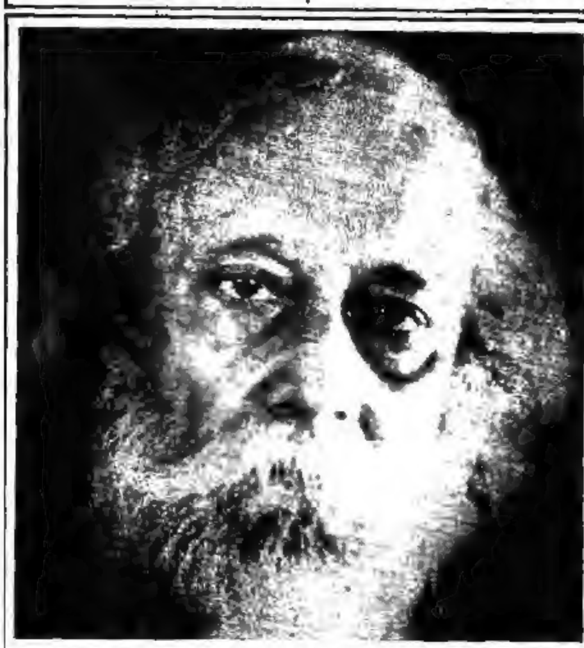
এর পাশাপাশি রবীন্দ্রনামাংকিত প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যর্থতা ও রবীন্দ্রপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর সাংগঠনিক জড়তা বিস্ময়কর। এসব জায়গায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'শুধু রাশি রাশি শুষ্ক কুসুম হয়েছে পুঁজি'। শুধুই ভক্তির কুসুম আর অন্ধতার চন্দন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি থেকে অজস্র অর্থ দোহনের নির্লজ্জ ব্যবসাদারি এসব প্রতিষ্ঠানকে গ্রাস করেছে। অথচ সাধারণ মানুষ ও রবীন্দ্রপ্রেমিকদের সামনে এরা সহানুভূতির হাত বাড়াননি। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ মানে শুধু নাচগান ও মিউজিয়াম নয়, নয় কারুর বাস্তুসম্পত্তি। তিনি সকলের নিত্যব্যবহার্য বহতা নদী।

প্রাতিষ্ঠানিক অহমিকার অচলায়তন ভেঙে রবীন্দ্রনাথের চেতনার মুক্তধারা সকলের জন্য অবারিত হোক।

পরিবর্তন

১৬ মে ১৯৮০
দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বাবিংশ সংখ্যা

প্রতি সংখ্যা ১.৫০
বিমান মাশুল:
পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা
ভারতের অন্যান্য স্থানে ২৫ পয়সা



সম্পাদক অশোক চৌধুরী
সংযুক্ত সম্পাদক : ধীরেন দেবনাথ
শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ আলোকচিত্র: অমিয় তরফদার

সমীপেষু

চীনের সঙ্গে মৈত্রী

পরিবর্তন-এর ১৪ মার্চ সংখ্যার সম্পাদকীয়টি পড়লাম। কিছু বক্তব্য রয়েছে।

ডাঃ কোটনিস ও তখনকার মেডিক্যাল মিশন সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে। ১৯৩৮ সালে চীন যখন আগ্রাসী জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত তখন জওহরলাল নেহরু, সুভাষ বসু, সরোজিনী নাইডু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ রবীন্দ্রনাথ, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতায় চীনা জনগণকে সাহায্য করার জন্য পাঁচজনের এক মেডিক্যাল মিশন চীনে পাঠান হয়। তাঁরা 'পিকিং'-এ নয়, যুদ্ধবিধ্বস্ত চীনের বহু অঞ্চলে কাজ করেছেন। এই মেডিক্যাল মিশন 'ডাঃ কোটনিসের নেতৃত্বে' নয়, ডাঃ মদনমোহনলাল অটলের নেতৃত্বে যায়, —ইনি স্পেনেও আরেক মেডিক্যাল মিশনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। 'অবশেষে সে দেশকে এতো ভালবেসে ফেললেন যে স্বয়ং ডাঃ কোটনিস চীনেই রয়ে যান আমৃত্যু'—এই মন্তব্যটিও ভুল। যে মহান আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ ডাঃ কোটনিসের জীবনে প্রতিষ্ঠিত তার সার্থক রূপায়ণ তিনি করতে চেয়েছিলেন ভারতে ফিরে এসে এখানকার মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনজন শারীরিক কারণে আগে ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য হন। ডাঃ কোটনিস ও ডাঃ বিজয় বসু রয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ডাঃ কোটনিস অসুস্থ হয়ে উত্তর চীনে মারা যান ১৯৪২ সালের ৯ ডিসেম্বর। পরের বছর ডাঃ বসু ভারতে ফেরেন। এই চিঠি প্রকাশ করে সেই মহান ও তাৎপর্যময় মেডিক্যাল মিশন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করবেন আশা করি।

দ্বিতীয়ত চীন ও রাশিয়ার সম্পর্ক সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে যে, ভারত-চীন মৈত্রীর জন্য 'পথ একটাই—এই দুই মহান দেশকে (অর্থাৎ চীন ও রাশিয়া)...সব তিক্ততা ভুলে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান শুরু করতে হবে, তারপর অন্য কিছু' ইত্যাদি। এটি ঠিকই যে সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাবিত সরকারী মহল ও 'নেতৃস্থানীয়' ব্যক্তিদের সক্রিয় অনিচ্ছা ভারত-চীন মৈত্রীর ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি বহু ঘটনায় সুস্পষ্ট এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের এই মন্তব্য। যদি সোভিয়েত রাষ্ট্রচক্রের দুষ্ট প্রভাব না থাকত তবে ভারত-চীন মৈত্রী ত্বরান্বিত হতো—এটি ঠিক, কিন্তু রাশিয়ার যে বর্তমান নেতৃত্বকে চীন সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী বলে আখ্যা দেয়, যারা পৃথিবীর বহু দেশে তার এই সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব বিস্তার করে চলেছে তাদের হাত থেকে ভারতও রেহাই পায়নি। অনুন্নত দেশগুলির নিজস্ব সম্পদের উন্নতি ঘটিয়ে সার্বিক অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করা যে কোন সমাজতান্ত্রিক দেশের আন্তর্জাতিক কর্তব্য হওয়া উচিত,— যার ফলে অনুন্নত দেশের জনগণ সামগ্রিকভাবে উপকৃত হন। কিন্তু রাশিয়া শুরু থেকেই ভারতের প্রাইভেট সেক্টরে টাকা ঢালতে থাকে। ১৯৫৪-তে এর প্রথম সাহায্য যায় বিড়লাদের হিন্দুস্থান গ্যাস কোম্পানিতে (মাইকেল কিনড্রনের 'ফরেন ইনভেস্টমেন্টস ইন ইনডিয়া' দ্রষ্টব্য)। এরপর টাটা-বিড়লাদের অ্যালুমিনিয়াম, সিমেন্ট, জুট কোম্পানির জন্য সে সাহায্য দিতে থাকে। এইভাবে রাশিয়া পুরোপুরি না হলেও প্রধানত এদেশের পুঁজিপতিদের পুঁজি লগ্ন করতে থাকে। এমনকি রাশিয়া ভারতে তৈরি জিনিসপত্র কম দামে কিনে নিয়ে বিদেশে বেশি দামে বিক্রি করে। ১৯৬৮তে UNCTAD-এর সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি এর প্রতিবাদ করতে বাধ্য হন (জার্নাল অব ইনডাস্ট্রি এনড ট্রেড, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮)। চিনি ইত্যাদির মত অনেককিছু রাশিয়া ভারত থেকে অনেক কম দামে কিনে নেয় আর নিকেল ইত্যাদির মত অনেককিছু রাশিয়া ভারতে অনেক বেশি দামে (আন্তর্জাতিক বাজারের প্রায় দ্বিগুণ দামে) বিক্রি করে। নৈতিকভাবে অবনমিত রাশিয়া তার কূপা মেটানোর নগ্ন ও নতুন ধরনের কায়দা ভারতে প্রয়োগ করে চলেছে। এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়া বৃহৎশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভারতকে তার দাবার ঘোড়ে হিসেবে ব্যবহার করছে। এই ঘোড়ে সে হাতছাড়া করতে চাইবে না স্বাভাবিক কারণেই। তাই চীন-সোভিয়েত মৈত্রীর বিনিময়ে ভারত-চীন মৈত্রী হওয়াটাই একমাত্র পথ—এই চিন্তা সুদূরপরাহত ও অবৈজ্ঞানিক।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থে ভারত-চীন মৈত্রী প্রয়োজন, এটি ঠিক এবং অন্য কোন শর্ত—নিরপেক্ষ ভাবেই হওয়া সম্ভব। যে জাপান চীনের ওপর একদা নগ্ন আক্রমণ চালিয়েছিল তাদের সঙ্গে বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, নিজস্ব অবস্থানের মধ্যে চীনের সম্পর্ক অ-বন্ধুত্বমূলক নেই। ১৯৬২-এর চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের পর ১৮ বছরের চেয়ে অনেক কম সময়েই এই চীন-জাপান মৈত্রী সম্ভব হয়েছে এবং তা কোন শর্তসাপেক্ষে হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটেন-জার্মান সম্পর্কসহ পৃথিবীর অনেক দেশেরই এইভাবে উদাহরণ দেওয়া যায়। ভারত-চীন মৈত্রীর জন্য যে অন্য পথও আছে সেটি জনতা সরকার তাদের প্রাথমিক প্রচেষ্টায় প্রমাণ করেছিলেন। এটি প্রত্যাশিত যে, কোন রাজনৈতিক বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কারণ ছাড়াই, সম্পূর্ণ নৈতিক ও মানবিক কারণেই ভারত ও চীন—এই দুই প্রতিবেশী, জনবহুল ও বহু হাজার বছরের বন্ধু দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলার জন্য সরকারী-বেসরকারী সমস্ত স্তরে প্রচেষ্টা চালান হবে। আর সরকারী স্তরে যাই হোক না কেন, চীন-রাশিয়া শুধু নয়, ভারত-চীনের ক্ষেত্রেও আপনাদের সর্বশেষ মন্তব্য অভিনন্দনযোগ্য—'দুই দেশের জনগণ কাছাকাছি আসবেনই একদিন, কারণ দুই মানব সম্প্রদায়ই ইতিহাসে ধৈর্য, শ্রম ও চূড়ান্ত সভ্যতার পরিচয় রেখেছেন।'

ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু, বর্ধমান

বালক ব্রহ্মচারী

১৬ এপ্রিল ১৯৮০ সংখ্যার 'পরিবর্তন'-এ আপনাদের বিশেষ প্রতিনিধি যে 'বালক ব্রহ্মচারী কি চৈতন্যের অবতার?' শীর্ষক কভার স্টোরিটি ছেপেছেন শ্রীঠাকুরের অপপ্রচারের উদ্দেশ্যে একখানি সুপরিকল্পিত প্রবন্ধ নিয়ে লেগেছেন—তা বুঝে, প্রতিবাদের সময়োচিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকল্পে এই বক্তব্যটি রাখছি।

বলেই রাখি—আপনাদের বক্তব্য যেখানে যেমনটি, আমার সুরের সাড়াও তেমন তেমনটি—কখনও গম্ভীর, কখনও তরল, কখনও চুটকী, কখনও আগুনে!

আপনাদের এই নূতন পত্রিকার স্বীকৃতি বা অনুরোধে কোনও আদর্শের নিশান জনসাধারণ এযাবৎ দেখতে পায়নি। কোন পরিবর্তন আপনারা চাইছেন? যদি সত্যিকারের ভালো কাজ করতে অর্থাৎ আত্মনিবেদিত হয়ে সমাজের সংস্কারে বা জাগরণে কেউ যদি নেমে থাকেন, যদি বা সত্যিকারের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ জনমানসে ভালবাসা শ্রদ্ধা পেতে শুরু করেন—তবে কি আপনার পত্রিকা তারই পেছনে লাগবেন? আর এই যে ভালোর দিকে বিবর্তনকে এগিয়ে আনার চেষ্টা তার ফলাফলগুলিকে বিপরীতমুখী করে দিলেই কি এই 'পরিবর্তনে'র প্রমাণ? তাই তো দেখা যাচ্ছে। নাকি, সস্তার চুটকীর চরিত্র-হননের আগে তাকেই জড়াতে চাইছেন যিনি নষ্ট ভ্রষ্ট পুরুষদের, নিষ্প্রাণ কেতাবী শাস্ত্রের আর তিলক-গেরুয়া-সর্বস্ব আচারের বহু ধর্মের পচা আস্তাবলগুলো থেকে ময়লা পরিষ্কার করার কাজে ব্রতী হরিজন কর্মীটি হয়ে আছেন? কেন মন-গড়া কথা তার নামে দিয়ে তার মুখে বসিয়ে দিতে এত আপনাদের অপচেষ্টা? কেন, tape-recoding করে নেননি তাঁর ভাষণ হুবহু? তাহলে তো কিছু বলার থাকতো না? যাই লিখুন তাঁর দেওয়া বক্তব্য বলে—সেটুকুও যেন ন্যাজা-মুড়ো ছাঁটা out of context না হয়, তা তো দেখবেন? নাকি 'অশ্বত্থামা হত' ইতি গোঙানির ধর্মের নামে ধর্মের পুত্রের নামে জয়লাভ বা কৌশলে চালিয়ে আপনারা দেবেন-ই? কেন তাঁকে সাজাতে চাইছেন বিখ্যাত ব্যক্তিদের চরিত্রে কালি-লেপক বলে? তিনি তো আজ পর্যন্ত কোথাও গায়ে পড়ে কোনও তথাকথিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদের ব্যক্তিগতভাবে বা নীতিগতভাবে আক্রমণ করেননি। এ ছোট কাজ তাঁর পক্ষে কতই অসম্ভব,—আর আমাদের লক্ষ কোটির কাছেও কতই অকল্পনীয়! ইংরেজ তাড়ানো যে ঘুরে বসে ক্লীবের মতো মার খাওয়ার পন্থায় হতে পারে না—বরং তার উলটো পন্থাই ঠিক—শ্রীঠাকুর তাঁর ১১ বছর বয়সের ইঙ্গিতে-নির্দেশে-উপদেশে তাই দেখিয়ে দিতেন তাঁর তথাকথিত মাননীয় কর্তা-ভজা গুরুজনদের! এতে কি অন্যায় দেখতে পাচ্ছেন? মুকুন্দ দাস, মাস্টারদা, সুভাষচন্দ্রের মধ্যে তিনি প্রশংসনীয় অনেক কিছু পেলেন বলেই কি তা গান্ধীজীকে গালি দেওয়া হয়ে যায়? ১৯৪২-এর জেলের বাইরের অগ্রকাণ্ডটি আর জেলের ভেতরের গান্ধীজী কি দেশকে একেবারে নিষ্ক্রিয় অহিংস-নীতির Quit India-ই দেওয়াতে পারছিলেন? সুভাষচন্দ্র কি 'নেতাজী' হয়ে দাঁড়ালেন তাঁর ক্লীবের মতো নীতিতে, না বজ্র-দুন্দুভির অধিকারে? গান্ধীজীর উত্তরসূরীদের কে কতখানি কল্পনার নিষ্ক্রিয় অহিংসাকে চিরস্থায়ী সত্য বলে প্রমাণে প্রমাণিত করে গেলেন—সেটা দেশবাসী দেখলো, দেখছে, দেখুক! শুধু খদ্দর জুটি জারি করে আর সাড়ম্বরে জয়ন্তী পালন করে তথাকথিত বরেণ্য নেতাদের স্ট্যাচু দিয়ে শুধু দিনের পর দিন পুতুল পুজোর ছলনা করা ছাড়া আর কিছু কাজ এদেশে হয়েছে কি?—হচ্ছে কি?—হবে কি?—সবাইয়েরই তো এটা মনের কথা—তবে সরল 'বালক' ছাড়া কে আর মুখের ওপরে বলবে বলুন—'এ মা, এ যে ন্যাংটো রাজা...!'—তাই বলি, বালকঠাকুর spade-কে spade বললেই হলো দোষ?...কেন না তাঁর ভাষণে যে বজ্র থাকে, তা বজ্র সুদূর বিস্তৃত—কারণ, সত্যের আবেগে তা জনমানসের জগদ্দল মনের পাহাড়—ও যে গুঁড়িয়ে দেয়! তাই তো ওঁকে ভয় সেই ওদের!

দ্বিতীয় লোকের কথা—ওঁর নামে চালাবার একি বা অপচেষ্টা? কেন টেনে আনেন মানায় টেরেসা সম্পর্কে কোনও অসংলগ্ন বা বাতুল প্রসঙ্গের জের? বিবেকানন্দ কি এই বলিষ্ঠ ঘোষণা করেননি, যে 'ভিক্ষা দিয়ে সমাজকে দাঁড় করানো যায় না?' শ্রীঠাকুরও এই খোলা কথা বলেই আসছেন—'ভিক্ষা দিয়ে ভিখারীর জাত বানানো যায় না বা দাঁড়াবার কাজে বা নীতিতে তিনি নেই। দয়াখানার ভিক্ষুী লগ্নী বিতরণে আর কম্বল-বাঁধার বিতরণের প্যারেড়া ধর্ম তিনি করেন না—করবেনও না। অন্যে যে যাই এখানে করুক আর বলুক—তিনি একে বিস্তৃতার স্বীকার করেন না। কে আছে বুকের পাটা নিয়ে এসে বলুক—বলুক তো দেখি—হে, হাঁ দারিদ্র্য হটানো বন্ধ করে দিয়ে (অর্থাৎ দারিদ্র্যমোচনের জন্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাদ দিয়েই)—শুধুমাত্র বঞ্চক-শোষক-ধনীসমাজের হাত থেকেই ভিক্ষা নিয়ে ধনিকদের সেবা করার চেষ্টাই কাজ, নিশ্চিত কাজ! ঐ শোষণ-বঞ্চনা নীতি-রীতিগুলোর উচ্ছেদ করতে চাইলে যে নানান বৈষম্য এসে পড়ে। রক্ত-অভাবে রাজনীতির কথা এসে পড়ে যদি! যদি যুগ-ভাগ্যনিয়ন্তা ঐ গণ-জাগরণের মন্ত্রে সমাজ কুম্ভকর্ণ হাই তুলে উঠে বসে?...তার চেয়ে এই ভাল...শুয়ে শুয়ে—'আর ভিক্ষা আর' মন্ত্র জপ করতে করতে পান্তা-পচাইয়ের জন্যে হাঁ করে মুখটা খুলে রাখাই ভাল—এ ধারণা পোষণ করে যারা...হাঁ, এই ঠাকুর তাদের ভালবাসতে পারেন না, ভালবাসতেও বলেন না।...কিন্তু...of all persons...অ্যাতো সতো ডিক্সাতো ঝাঁকালো ধর্মীয় সংস্থা থাকতে—ঐ মাতৃ-প্রতিম ভদ্রমহিলাকে নামে ধরে দোষ ধরতে যাবেন কেন শ্রীঠাকুর? তাঁর দেওয়া ধর্মের আচরণ-বিধির প্রথম কথাই হলো—'মায়েদের ব্যথা দিয়ো না।' তিনি সব মায়েকেই মা দেখেন,—বালকটি হয়ে, সন্তানটি হয়ে...। তাই বলি, এক্ষেত্রেও আপনারা সীমা ছাড়িয়ে গেছেন।

এবারে প্রশ্ন ওঠে—আপনার বইয়ের প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠার ওপরে মুদ্রিত ঐ কটি কথারে—'বালক ব্রহ্মচারী কি চৈতন্যের অবতার?' প্রসঙ্গটি আমরা তুলিনি,—তবে আপনারাই খুঁচিয়ে তুলছেন। তুলছেন যখন, তখন নিশ্চয়ই as a literary sportsman আপনি আমার বক্তব্যটি বাকিরে দেখবেন!

প্রথমেই বলবো—এ হেন গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ নিয়ে আপনার বিশেষ প্রতিনিধি এলেনই যখন,—আমাদের কেন্দ্রে এসে কেন প্রশ্নটা সরাসরি তোলেননি? দূর-দূরান্তের গ্রাম-গঞ্জের দেওয়াল লিখনের ছোট প্রতিশ্রুতির ওপরে বক্তোক্তি করেই থাকছ আমার?—এরা কি প্রামাণ্য প্রমাণগুলো হাতে করে নিয়ে মাঠে-হাটে-ঘাটে যেভাবে সাংবাদিকের satisfaction-এর জন্যে?—তাই যে প্রশ্নের উত্তর এখানেই চেয়ে, শেষে দেওয়া চলতো।

—তা আমাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারেও চেপে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা কেন বলুন তো ? কী বুঝবো ?

তবু, যতটুকু সম্ভব হয়—এ বিষয়ে আলোকপাত করি, একটু—কেমন ?…আমাদের রক্তে শুধু রক্তের ধারকের নিত্য সাক্ষ্যই আছে। অনেক পরের কালের ভক্তদের—ছন্দের 'মঙ্গল'-'ভাগবত' আর 'অমৃত'—একরক্ম গল্প-সর্বস্ব কল্পনা-সবল আশ্রয়ে আমরা যাই না। এটুকু খেয়ালে রাখুন—এক বংশধারার রক্তের ধারকধারীরা কখনও পরের বাবাকে নিজের বাবা বলবে না,—পরের বংশাবলীর ধারা ধরে ধরে তাদের বাপ-পিতেমো-চোদ্দপুরুষের নামে তর্পণ-শ্রাদ্ধাদি নিশ্চয়ই করবে না—করতে পারে না ? তাহলে তো খোঁজই করতে হয়। ৺সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের আর সাথে রত্নেন শীলের যোগ্য বন্ধু দেশ-বিখ্যাত ৺পণ্ডিতপ্রবর হেরম্বনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় কাদের বা কোন বংশধারার নামে তর্পণ-শ্রাদ্ধ করে চলছেন ? তাঁর ৩৮ নং পটলডাঙ্গা স্ট্রিটের বাড়িতে আজও তাঁর সুযোগ্য পুত্র অধ্যক্ষ সুধাংশু ভট্টাচার্য শাস্ত্রী (অম্বিকা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ—যিনি সেদিনও ভারত সরকারের সম্মানী পেলেন) আছেন। তাঁকে প্রশ্ন করলেই শুনবেন—কেন ঐসব কাজে চতুর্দশ-পিতৃপুরুষের নাম শুরু করা হয়—শচীদেবী অর্থাৎ মহাপ্রভুর মায়ের পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী থেকে। তারপরে আসেন—তাঁর পুত্র (১) বিষ্ণুদাস—তৎপুত্র (২) গোপালদাস (৩) রাজীবলোচন (৪) রামকৃষ্ণ (৫) রামচন্দ্র (৬) রামদেব (৭) বলরাম (৮) রামশঙ্কর (৯) রামকিঙ্কর সিদ্ধান্ত (১০) হরনাথ শিরোমণি (১১) অম্বিকানাথ বিদ্যাভূষণ (১২) হেরম্বনাথ তর্কতীর্থ ও তদ্বী চারুশীলাদেবী (১৩) হেরম্বনাথের ভাগিনেয় ও চারুশীলাদেবীর পুত্র শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী। এই বীরেন্দ্রচন্দ্র-ই ৫/৭ বছর বয়স থেকে বিষ্ণুপুর (মেদিনীপুরে), ত্রিপুরা (কুমিল্লা-উজানচর) ও ঢাকা (ফরিদপুরে) অলৌকিক স্বীকৃতি পেতে থাকেন ও নিজের গুণমাহাত্ম্যেই পরিচিত হন—বালক গোঁসাই, বালক ঠাকুর, বালক ব্রহ্মচারী বলে। এ পরিচিতি তাঁকে সমাজ দিয়েছে—কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়, কোন গুরুর সান্নিধ্যে তাঁকে আসতে হয়নি।

এই বংশাবলীর উল্লেখ সৌভাগ্যবশত আজও ৩৫ নং গোকুল মিত্র লেন, কলকাতা-৫ থেকে 'পাশ্চাত্য বৈদিক সংঘে'র ১৩৭০ সালে মুদ্রিত—প্রকাশিত 'পাশ্চাত্য বৈদিক বংশাবলী' বইটিতে পাওয়া যায়।

ঐ বংশধারার মাঝে বলা হয়েছে, হয়ে এসেছে—যে, মহাপ্রভু একান্তগোপনে তাঁর প্রিয় মাতুলকে বলে যান যে তিনি পুনরায় এসে দুঃখযন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের উদ্ধারের কাজে আবার নামবেন। কিছুবা নষ্ট, কিছু উদ্ধারিত, কিছু গোপনে রক্ষিত নানান পুঁথি কুলজী কড়চাতে প্রয়োজন মতোই তাঁর ভাগিনের যুগে আমার কথাও কোথাও কোথাও পাওয়া যায়—কোথাও বা তাঁর ভবিষ্যৎ কর্ম-প্রকল্পের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। আমাদের বন্ধু অষ্টে রাখা তেমন ২/৩টি প্রামাণ্য প্রমাণের photo-copy গ্রহ করে আমরা তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি গ্রন্থে দিয়েছি—যা নূতন আকারে বঙ্গানুবাদ সহকারে শীঘ্রই বেরুচ্ছে।

শত্রুরা যাই বলুক, আর ভক্তেরা যাই বলুক,—শ্রীঠাকুর নিজে কিন্তু কোনও দিনও এইটুকুর বেশি বলেননি, সেইটুকু বলছি :

'আমি তাঁর রক্তের ধারক, তাঁর বেদ বাণীর বাহক—যেন তাঁর রক্তের মর্যাদা রেখে যেতে পারি—তাঁর অসমাপ্ত কাজটি নাম আর সুরের মাধ্যমে শেষ করে যেতে পারি—যেন সমাজকে জাগিয়ে দিতে পারি।' তাই তিনি নাম নিয়েই কাজ করে চলেছেন, তবে যুগ-পরিবর্তনে প্রয়োজন অনুসারে নামের নব-রূপায়ণ করেছেন, যার কার্য-কারণ ব্যাখ্যা আপনাদের কাজে লাগবেনা। কার্তিকপূজার জন্য গদী আর দলের কাড়াকাড়ি, হানাহানি—এসবের জন্য সন্তানদল নয়। অমনণই তো সব—তার মুমূর্ষু শব অবস্থা থেকে তাকে জাগাবার জন্যে অন্তঃস্রোতা চৈতন্য-ধ্বনির সঞ্চার করে করে চলেছেন বিশ্ব-জগতের বাস্তব পরিবেশে।

এই হিন্দু অবশ্যই শব ধর্মচেতনা, আচার-সর্বস্ব ক্রিয়াকাণ্ড আর প্রাণহীন কেতাবী পাণ্ডিত্যের ধারে কাছে দিয়েও যান না, যাননি। যে পরম চৈতন্যের সুরে নিজেদের চেতনের সুরে একাকার করতে পেরে—বেশ কয়েকজন মানুষ এক যুগে ঋষি হয়ে যান—যাদের মন্ত্র-দর্শনের অনুভূতি সঙ্কলিত আকারে পরে ৩/৪টি বিখ্যাত বেদ-গ্রন্থ নাম নিয়েছে, সেগুলোই কালে সংস্কারের আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে। সেই আবরণটি পরিষ্কার করে আমাদের সবারের জন্যই সহজাত অধিকারে পরম চৈতন্যের সুরে পৌঁছবার উপযুক্তভাবে অনুভূতি-মার্গে তাঁর সুরের ছোঁয়া দিয়ে ধরিয়ে দিয়ে সবাইকেই ঐ ঋষিদের সুর জগতের অধিকার দিচ্ছেন। এই-ই তাঁর মন্ত্র-দীক্ষা, যা বাক-সর্বস্ব আর ক্রিয়া-সর্বস্ব বৈদিকী দীক্ষা নয়, পৌরাণিকী দীক্ষাও নয়,—যা আসলে হল 'সহজ-দীক্ষা'। ফল হচ্ছে যেখানে…যেটুকু…যার যার মধ্যে…তাতেই এতো আবেগ—এতো উন্মাদনা—এতো সম্বন্ধ! ভাবিয়াছেই কাজে, সম্পাদক মহাশয়, ভাবিষ্যতের গর্ভে কী আছে ?—এতে আপনাদের কী মাথা-ব্যথার কারণ থাকতে পারে, বলুন। যেখানে এই দীক্ষা দিয়ে তিনি নিজে কিছু কখনও গ্রহণ করেন না। কখনো নিজের জন্য প্রণামী দর্শনী কি নিতে দেখে থাকেন? সমাজের বুকে এ কি বোঝা বলছ? এমনই মন-কল্প তিনি খেলা মাঠে, হাটে হাজারে হাজারে দীক্ষা দিয়ে চলেছেন—শুধু মন-দক্ষিণায়—মন-দক্ষিণায়!

আপনাদের এ লেখাটিতে কতকজনের চেষ্টার ছাপ আছে—যারা পরস্পরকেও চেনে না। আপনি আর কি করবেন এক উদ্দেশ্যের গন্ধ ছিটিয়ে তাতে তোলার চেষ্টা ছাড়া ? শ্রীঠাকুরকে যখন আর মনের কালিমার ঢোকানো গেলই না—তখনও ঐ উদ্দেশ্যের বদহজমের জেরই বেরিয়ে পড়বে—একরম দুটি একটি মন্তব্য—

'চার রকম ইঞ্জিনের বাবা!'—'কি বাবা, উক্ত হোলো ?'…'মহাপুরুষ বলে আত্ম-ঘোষণা ?' 'হর নাথ হ্যানডিল্ড হ্যাপার !' 'শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত গৃহকোণে' 'তাঁর বক্তব্য শুধু আবেগ আর আবেগ'—'মন্ত্রের কাগজ বেরোয় বাক্স থেকে—আর দীক্ষার টাকা ঢোকে আর এক বাক্সে!' 'শুধুই গা-গরম করা স্লোগান কেন' 'আশ্রম ও ধন্দ আর পোল্ট্রিম্যান'—প্রসঙ্গের মধ্যে যত উদ্দেশ্য-মূলকতা। উর্দীপরা তরুণ আর বিপ্লবী ছাত্রদেরও দোষ একটু ধরা চাই-ই ? হিংসা ও দ্বেষ একাকার করে ফেললেন অভীষ্ট উদ্দেশ্যে তাঁকে ছোট করতে ? পুলিশে আর তাঁতে কী সম্বন্ধ ? এ প্রশ্ন তোলার আগে রাজশক্তির সঙ্গে কৃষ্টি-হজরত-চৈতন্যের সম্পর্ক একটুও ভাবলেন না ? মাম-দৈবা নীতি না বলে যাদের তাঁর নীতির কাছেপিঠে—এটাও দেখবেন না ? লাল বইটা যে প্রেমের লাল-গোলাপে চিহ্নিত—লাল-তারার চিহ্নিত নয়—তা কি দেখেছেন, দেখবেন ? খোসলা কমিশনে দেওয়া প্রস্তাবের প্রামাণ্য নিদর্শন দেখেই গেলেন না কেন ?

তাঁর এত ভালো, যে ভাল নয়—এই বুঝি শেষ পর্যন্ত বোঝাতে চাইছেন আপনারা ?

মহাশয়, কেন সত্যি করে জানতে চান না—শ্রীঠাকুরের চরণ-তীর্থে কেন এত ব্যাকুলতা…গেল বোগে…? কেন বুকেও মানতে চান না, যে দেশের গদ-জাগরণের বিপ্লব শুধু নাম-দুন্দুভিতেই জাগে ? কত শান্তিস্বত্বার ছুগে রাজনীতি-ধর্মনীতির প্রধানেরা নানাভাবে তাঁকে পিষতে চাইলো—কোথায় তাঁরা আজ ? কেন হাল ছেড়ে দিয়েছে তারা, কেন চরণে এসে পড়েছে সব ? আপনার সেই ২০শে মার্চ কমিটির যে গর্ভেই মৃত্যু হয়েছে, তা কি জানেন ? লজ্জায় পড়বেন, তবুও বলি এ মড়া আর নাচিয়ে নিজের মুখে না কালি দিলেই পারতেন। কমিটির তারা আজ ক্ষমা চায়, দীক্ষা নেয়, শুভ পদার্পণ চায়—কেন ? রাজনৈতিক party কেন রক্ষা করে, শান্তি করে ?

কার ঢাক আপনারা বাজাতে চলেছেন ? কিছু দেখবার আগে জেনে লিখলেই ভাল হতো। তবুও বলি, আপনারা ভালোকে আর আলোকে চিনে নিন।

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সংগঠকের পক্ষে

[শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন—শ্রী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে কথা বলার সময় টেপ রেকর্ডার নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ঐ দুর্ঘটনা বস্তুত প্রতিবেদকের সাধ্যের বাইরে ছিল ; তাই নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সেদিনের আলোচনায় শুধু মাতাজী বা মায়াও উঠেছেই নয়, অন্য এক বিখ্যাত ব্যক্তি সম্পর্কেও শ্রী ব্রহ্মচারী মন্তব্য রেখেছিলেন। কিন্তু ঐ কথা শ্রী ব্রহ্মচারী লিখতে নিষেধ করেছিলেন। আমি তাঁর অনুরোধ রেখেছি।

মামার তৈরেগা প্রসঙ্গ অস্বীকার করেই শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"শ্রীঠাকুরও এই খোলা কথা বলেই আসছেন—ভিক্ষা দিয়ে ভিখারীর জাত বানাবার বা বাড়াবার কাজে বা নীতিতে তিনি নেই।" দুইয়ে মিলে কী দাঁড়ায় ?

শ্রী ব্রহ্মচারী বিখ্যাত ব্যক্তি ; তাঁর সন্তানদলও খ্যাতনামা। তাঁদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে অনেক জিজ্ঞাসা। কিছুকাল ধরে ট্রেনে এবং অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে তাঁদের নানারকম পোস্টার সে কৌতূহলকে তীব্রতর করেছে। সেই জিজ্ঞাসা নিয়েই শ্রী ব্রহ্মচারীর কাছে এবং তাঁর আশ্রমে গিয়েছি। যা দেখেছি, যা শুনেছি তাই লিখেছি। গালগল্প কথা দিয়ে যে লেখাটা তৈরি করানো হয়নি শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠিতেই তার প্রমাণ রয়েছে। "এত ভালো যে ভালো নয়"—এমন কথা বোঝাবার কোন-বাসনা ছিল না।—লেখক।]

তারকেশ্বর

গত ১৬.৩.৮০ তারিখের (২য় বর্ষ, অষ্টদশ সংখ্যা) "পরিবর্তন" পত্রিকায় মৃদুল দাশগুপ্ত কর্তৃক লিখিত 'তোলে বাবা পার করেগা' শীর্ষক প্রবন্ধে তারকেশ্বর মঠ এবং এসটেট সম্পর্কে যে কয়েকটি ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে উহার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি :

১। পথিপার্শ্বের পয়ঃপ্রণালী সংস্কার করার দায়িত্ব কেবল এসটেটের নয় ; এ বিষয়ে মুখ্য দায়িত্ব স্থানীয় পৌরসভার উপর ন্যস্ত আছে।

২। এসটেটের অর্থ কর্মীগণের বেতন ব্যতীত অন্যান্য বহুমুখী কার্যে ব্যয়িত হয়। এসটেটের কার্যাবলীর মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হইতেছে :

(ক) স্থানীয় কলেজকে ১৫ বিঘা জমি দান।

(খ) স্থানীয় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য জমিদান এবং বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ।

(গ) মঠে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপন, যেখানে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার প্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত আছেন এবং ছাত্রগণ বিনা ব্যয়ে শিক্ষালাভ করে।

(ঘ) গত ১৯৭৮ সালে বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য প্রায় ১০,০০০ টাকা ব্যয়।

(ঙ) অন্যান্য নানা খাতে ব্যয়।

৩। যে কর্মীগণের ন্যূনতম বেতন পূর্বে ৩৭.৫০ টাকা ছিল, তাহারা তদতিরিক্ত বিনামূল্যে খাদ্য ও বাসস্থান এবং চিকিৎসার খরচ পাইত। বর্তমানে তাহাদের মোট ন্যূনতম বেতন ১৮৭.৫০ টাকা। তদতিরিক্ত বিনামূল্যে বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। অধিকন্তু শীঘ্রই তাহারা প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুযোগও পাইবে। তাহাদের দৈনন্দিন কার্যকাল নির্দিষ্ট এবং বিনাকারণে কাহাকেও চাকরি হইতে অপসারিত করা হয় না।

৪। মঠে কোনও কর্মচারী এগারখানা ঘরে বাস করেন এবং তিনি সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী, ইহা সত্য নয়।

৫। মঠের মোহান্ত মহারাজ ৭-৮ মাস এসটেটের ব্যয়ে বাংলার বাহিরে থাকেন তাহাও সত্য নয়। চাতুর্মাস্য ব্রতোপলক্ষে তিনি ব্রতের নিয়মানুযায়ী জনসংসর্গ ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থানে দুই মাস অবস্থান করেন। বৎসরের অন্যসময়ে বিভিন্ন জরুরী কাজে তাহার মোট অনুপস্থিতির সময় দুই মাসের অধিক নয়। মঠের বাহিরে গেলে তাহার যাতায়াতের এবং অন্যত্র বাস করিবার ব্যয় এসটেট হইতে বহন করা হয় না।

আশা করি শ্রীদাশগুপ্তকে এবং অন্য কোনও ব্যক্তিকে ভবিষ্যতে মঠ এবং এসটেট সম্পর্কে ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশন হইতে নিবৃত্ত করিবেন।

কে কে মজুমদার,
ম্যানেজার, তারকেশ্বর এসটেট

লেখকের উত্তর

১। যে শহর গড়ে উঠেছে মন্দিরকে কেন্দ্র করে, যে শহরে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী আসেন লক্ষ লক্ষ টাকা যেখানে বাৎসরিক আয়—সেখানে নেই পান্থ নিবাস, নেই তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামাগার, নেই স্নানাগার, শৌচাগার। তারকেশ্বর পুরসভার কাঁধে বোঝা চাপিয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষ নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। প্রসঙ্গত আবার উল্লেখ করছি- ১৯২৪এ দেশবন্ধু, নেতাজী প্রমুখ নেতৃবর্গ যে পাঁচটি দাবিতে আন্দোলন করেন তার প্রধানতম দাবি ছিল। মন্দিরের মোট আয়ের ৭৫ শতাংশ যাত্রীদের জন্যে এবং তারকেশ্বর অঞ্চলের

উন্নতির জন্যে ব্যয় করতে হবে।

২। (ক) ও (খ)—কলেজ ও স্কুলের জন্যে জমি দানের সঙ্গে বাৎসরিক আয়ের সম্পর্ক কি? সে জমিতো রাজা তারামল্লই রেখে গেছেন।

(গ) তারকেশ্বরে যে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় আছে সেখানেও রয়েছে নানান দুর্নীতি। একটি উদাহরণ: এখানে এমন একজন ছাত্র আছেন যিনি এই মহাবিদ্যালয়ের করণিকও। ছাত্রটি মোহান্তের নিকট আত্মীয়। এই মহাবিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস হয় না।

(ঘ) বন্যা কি বছর বছর হয়? বছর বছর বন্যাত্রাণে দান করেন মন্দির কর্তৃপক্ষ?

(ঙ) অন্যান্য নানা খাত কি কি? জনসাধারণ মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সে হিসেবপত্রই তো জানতে চান।

৩। খাবারের নামে কর্মীদের যা দেওয়া হতো, কর্মীদের অভিযোগ, তা মুখে তোলা যেতো না। খাবার দেবার ব্যবস্থা বন্ধ করে অতি সম্প্রতি মাইনে বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু এখনো এমন কর্মী আছেন যাদের মাসিক মাহিনা ১০০ টাকারও কম। ২০.৩.৮০ তারিখের একটি প্রচারপত্রে কর্মচারী সমিতি এ তথ্য জানিয়েছেন। কর্মীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা হলো গোশালার পাশে ধরমার ঝুপড়ি ঘর। বৃদ্ধ এক এল এম এফ ডাক্তার আর প্লেরেকপাতা ট্যাবলেট (অনেক সময় তাও পাওয়া যায় না) নিয়ে চলছে কর্মীদের জন্যে দাতব্য চিকিৎসালয়। পান থেকে চুন খসলেই ছাঁটাই – এরকম ঘটনা বহু আছে। তিরিশ বছর চাকরি করেছেন এমন এক দারোয়ান রামনগিনা সিংকে কেন ছাঁটাই করা হয়েছিলো কর্তৃপক্ষ জানাবেন কি?

ছাঁটাই এবং অতিরিক্ত সময় বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করানোর অভিযোগ 'তারকেশ্বর কর্মচারী সমিতির' প্রচারপত্রে দেখেছি। বিভিন্ন সময়ে বিনা কারণে ছাঁটাই হয়ে যাওয়া কর্মচারীদের অভিযোগপত্র 'তারকেশ্বর কর্মচারী সমিতির' সভাপতি নৃপেন্দ্রনাথ সিংহরায়ের কাছে আছে।

৪, ৫। মঠে ১১টি ঘর নিয়ে যে কর্মীটি থাকেন তিনিই সর্বেসর্বা এবং মোহান্ত মহারাজ বছরের অধিকাংশ সময়ই এসটেটের কাজে তারকেশ্বরের বাইরে থাকেন—এ অভিযোগ কর্মচারী সমিতির। তারকেশ্বরে মন্দির অঞ্চলে এসব নিয়ে পোস্টারও দেখেছি। শুধু কর্মচারীরাই নন, স্থানীয় জনসাধারণও এর সত্যতা স্বীকার করেছেন।

তারকেশ্বর এসটেটের ম্যানেজার শ্রী মজুমদারকে ধন্যবাদ তিনি তাঁর পত্রে পান্ডাদের অত্যাচার, মন্দির কর্তৃপক্ষের আমলা তোষণ, সতীশ গিরির রুপোর পালঙ্ক ও ১৬ ভরি রুপোর সাপ চুরি ইত্যাদি প্রসঙ্গের উল্লেখ না করে প্রকারান্তরে এসব অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁকে আরও ধন্যবাদ, পরিবর্তনে রচনাটি প্রকাশিত হবার পর তিনি কর্মচারীদের সাপ্তাহিক ছুটির দিন ধার্য করেছেন।

মৃদুল দাশগুপ্ত

রজনীশ

শ্রীবিকাশের লিখিত শ্রীরজনীশ আশ্রমের পরিচয় পড়লাম। বিবরণ পড়ে স্পষ্টই বোঝা যায়—লেখকের উদ্দেশ্য ভগবান শ্রীরজনীশ এবং তার আশ্রম সম্বন্ধে খোঁজপূর্বক জনতার কাছে সত্যবার্তা না পৌঁছিয়ে অন্যান্য পত্র-পত্রিকার মত ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশন। উনি পত্রকারের পরিচয় না দিয়ে লুকোচুরি ভাবে আশ্রমটা দেখেছেন। যদি নিজেকে পত্রকাররূপে পরিচয় দিতেন তাহলে ভালবাসা সহকারে তাকে আশ্রমটা দেখানো হতো। মিথ্যা এবং ভুলেভরা রচনায় লেখক যে দুজন সন্ন্যাসিনী—মা বিনোদিনী এবং মা বাসন্তীর—নাম উল্লেখ করেছেন তারা দু জনেই কাল্পনিক। ঐ নামের কোন সন্ন্যাসিনী আশ্রমে নেই।

রচনাটা পরস্পরবিরোধী তথ্যে ভরা। লেখক লিখেছেন যে তিনি ৪ থেকে ৯ সেপটেমবর আশ্রম পরিদর্শন করেন, আবার অন্য জায়গায় বলছেন যে ১ সেপটেমবর তিনি মা যোগলক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাকে শ্বেতবস্ত্রে দেখেন। কিন্তু অন্য সন্ন্যাসীদের মতন উনিও সর্বদা গেরুয়াবস্ত্র পরিধান করেন। অতএব স্পষ্টই বোঝা যায়—উনি মা যোগলক্ষ্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। আর এক জায়গায় উনি লিখেছেন সন্ন্যাসীদের গলার মালাগুলি বিভিন্ন দামে বিক্রয় হয় এবং সবচেয়ে সস্তা মালার দাম ১৫ টাকা। এই তথ্যটা একেবারেই ভুল। সন্ন্যাস দীক্ষার সময় ভগবান শ্রী নিজে প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে একটা মালা দেন। তারজন্য কোন দাম নেওয়া হয় না। মালা এখানে বিক্রয় হয় না।

স্পষ্টই বোঝা যায় যে লেখক আশ্রমে নিরপেক্ষভাবে কিছুই দেখেননি। সত্য মিথ্যা বিবেচনা না করে প্রায়ই ভুল তথ্য লিখে ফেলেছেন। এই রকম রচনা আপনাদের পত্রিকায় শোভা পায় না।

লেখকের দৃষ্টি আশ্রমের সম্পত্তি এবং নিন্দাবার্তার দিকে। শ্রীরজনীশ আশ্রমের মতন একটা প্রতিষ্ঠিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থাতে যে শত শত গহন গভীর আধ্যাত্মিক প্রয়োগ চালানো হচ্ছে সেটা দেখবার ক্ষমতা ওর নেই। ভগবান শ্রীরজনীশ একটা নতুন উর্জাক্ষেত্র তৈরি করে তার পরিবেশের মধ্যে একটা নতুন সুস্থ ও উল্লসিত মানুষ তৈরি করে সমাজব্যবস্থাকে লাভান্বিত করছেন। বিভিন্ন প্রকারের ধ্যান প্রয়োগ এবং মনোচিকিৎসাগুলির লক্ষ্য একটি নতুন মানুষের আধ্যাত্মিক পথে যাত্রা। এই ধ্যানবিধিগুলিকে প্রয়োগ না করে তাদের প্রভাব জানা যায় না।

লেখক যে সন্ধ্যাদর্শনের বর্ণনা দিয়েছেন সেটাও পুরোপুরি ভুল। ঐ সময়ে কোন সূফী নৃত্য হয় না। মানুষকে বস্ত্রবিহীন করার তো প্রশ্নই নেই। এইরকম মিথ্যা তথ্য প্রকাশিত করে লোকের যে কি উপকার করা হয়েছে তা বোঝা মুশকিল। 'সন্ন্যাস' পত্রিকাটি দ্বিমাসিক এবং কেবল হিন্দি আর ইংরাজিতে প্রকাশিত হয়। বিশ্বের একুশটি ভাষায় ওর কোন প্রকাশন নেই। স্পষ্টতই লেখক আশ্রম সংক্রান্ত এই খুঁটিনাটি কথাগুলি জানেন না।

ভগবান শ্রীরজনীশের সন্দেশ আজ বিশ্বের কোণে কোণে পৌঁছেছে এবং তার সত্য উদ্ঘাটনে বিশ্ব বেশ ভালভাবে পরিচিত হয়েছে। সেজন্যই দুনিয়ার প্রত্যেক জায়গা থেকে বিভিন্ন শাখার বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি দলে দলে রজনীশ আশ্রমে পুনাতে প্রতিদিন চলে আসছেন।

স্বামী সত্যবেদান্ত
প্রেস কার্যালয়, পুনা

লেখকের বক্তব্য

রজনীশের নতুন নতুন গহন গভীর আধ্যাত্মিক ব্যাপার-স্যাপার কোন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কোন পরিবর্তন আনছে এবং তাতে সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে লাভান্বিত হবে তা বুঝতে এতটুকু বুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। পুনার পথে-ঘাটে রজনীশ ভক্তদের বিকৃত কাম আচরণই তা চিৎকার করে বলে দেয়। শুধু যৌন রুগীদের নিয়েই যাদের পসার তারা আর কিছু না হোক অন্তত বিবেকের দংশনে দিশেহারা হতে বাধ্য।

মা বিনোদিনী ও মা বাসন্তীর অস্তিত্ব বেমালুম অস্বীকার করে বসলেন? মা বাসন্তী নয় বিদেশিনী, কিন্তু মা বিনোদিনী তো আশ্রমেরই স্থায়ী বাসিন্দা! সন্ন্যাস পত্রিকা নিয়েও হাস্যকর গল্প গড়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ফুল স্ক্যাপ আকারের পাক্ষিক সন্ন্যাস পত্রিকায় ঘোষণা করা আছে—বাংলা ও তামিলসহ ২১টি ভাষায় সন্ন্যাস পত্রিকা প্রকাশ হয়। কোনটা সত্য? স্বামী সত্য বেদান্ত মহাশয়, না ঐ পাক্ষিক পত্রিকার ঘোষণা?

সান্ধ্য দর্শনের বর্ণনায় যে নৃত্যের উল্লেখ করা হয়েছে তার নাম হয়তো 'সূফী নৃত্য' নয়। কিন্তু হাতে হাত রেখে চক্রাকারে যে আদিম উল্লাসের নৃত্য হয় তার সঙ্গে তথাকথিত সূফী নৃত্যের কোন তফাৎ আছে কি? বস্ত্রবিহীন করার প্রসঙ্গে বলছি, বেশ কিছু 'ভিকটিমের' সঙ্গে আমার আলোচনা রেকর্ড করা আছে।

মা যোগলক্ষ্মীর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম ৭ সেপটেমবর, ১ সেপটেমবর নয়। এটা মুদ্রণ ত্রুটি। ছাপার ভুল আরো ছিল। যেমন, ১৯৭৮-এ আয়কর দেয়া হয়েছে ৯০% বিদেশী মুদ্রায়, ১০% নয়। এই ভুলটি নিয়ে কোন প্রতিবাদ নেই! মা যোগলক্ষ্মী সর্বদা শ্বেতবস্ত্র পরেন—এই অসত্য কথার মাধ্যমে সত্য বেদান্ত মহাশয় সম্ভবত একটি বিশেষ তথ্য গোপন করতে চেয়েছেন। ইদানিং শ্বেতবস্ত্র পরিধান করা নিয়ে রজনীশের সঙ্গে মা যোগলক্ষ্মীর যে 'পারসোনালিটি ক্ল্যাশ' চলছে সেই খবর আজ আর আশ্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। সেই জন্যই কি রজনীশ তার প্রাতঃভাষণে বিনা প্ররোচনায় বার বার বলেন—'মা যোগলক্ষ্মীর নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই, আমি যা বলি সে তাই বলে—তাই করে?'

দীক্ষার সময় প্রতিটি 'সন্ন্যাসী'কে বিনা মূল্যে একটি মালা উপহার দেওয়া হয় এ তথ্য আমার জানা ছিল না। তাতে কিন্তু মালা বিক্রি হয় না একথা প্রমাণিত হচ্ছে না। মালা বিক্রি হয় এবং সব থেকে সস্তাটির মূল্য ১৫ টাকা। আশ্রমের ভিতরের দোকানে ঝুলিয়ে রাখা প্রতিটি মালাতে ছোট্ট চিরকুটে দাম লেখা থাকে কেন? মহাত্মা গান্ধী বাজার ও অন্যান্য বাজারে সহ আশ্রমের প্রধান সড়কের আশে-পাশে তাহলে জামা কাপড়ের সঙ্গে মালা বিক্রির দোকান খুলেছে কেন? দোকানদাররা কি গেরুয়া বস্ত্র পরেন না? ভগবান রজনীশের ব্যবসার সুবাদে কিছু জুনিয়র রজনীশও ছোটখাট ব্যবসা করে নিচ্ছে—একথাই কি বলতে চান সত্য বেদান্ত মহাশয়?

রজনীশ আশ্রমের সবকিছু দেখে ভেবেছিলাম আশ্রমের ব্যবসাটা সুসংগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত এবং সমালোচনার ঊর্ধ্বে। কিন্তু সত্য বেদান্ত মহাশয়ের প্রতিবাদপত্রে প্রতিবাদের অসংগতি, সত্যকে অসত্য করার প্রয়াস এবং জোর করে আত্মপ্রচারের চেষ্টা দেখে সে ধারণা কেটে গেল। 'পূর্বাগ্রহ দৃষ্টি' নিয়ে সব সাংবাদিক অনুসন্ধান করেন না। সমস্ত ব্যাপারটা আমি মুক্ত ও খোলা মনেই জানতে চেয়েছিলাম। তাই অকারণে কোন কেচ্ছাকে প্রাধান্য দিইনি। যেমন নামী-দামী স্থানীয়দের দামী গাড়িতে সন্ন্যাসিনীদের ভিড় করার খবরটা উল্লেখ করিনি। এমন আরো অনেক খবর আছে যাতে বোঝা যাবে রজনীশের ধ্যান প্রয়োগ সমাজকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ করা হয়েছে—লেখকের দৃষ্টি আশ্রমের সম্পত্তি ও 'নিন্দা বার্তার' দিকে। সত্য বেদান্ত মহাশয় এই দুটি ব্যাপারেই বেশি সচেতন বলে মনে হচ্ছে। এই ধরনের ব্যবসায়ে নিন্দা বার্তা ও সম্পত্তি বৃদ্ধি এমন ভাবেই জড়িত যে নিজের অজান্তেই সত্য বেদান্ত মহাশয় তার প্রতিবাদপত্রে সেই সত্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ধন্যবাদ।

শ্রীবিকাশ

॥ ২ ॥

'ভগবান' রজনীশ, সাঁইবাবা ইত্যাদি নামের আড়ালে ভারতের মত বিরাট গণতান্ত্রিক দেশে ভণ্ডামি, অশালীনতা ব্যভিচার কিভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ভেবে অবাক হচ্ছি। 'আদিম সুড়সুড়ি' মেটানোর এটা একটা অভিনব পন্থা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের জিজ্ঞাস্য—যে সকল প্রশাসনিক সংস্থা এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন, তারা নীরব কেন? তারা কি এ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নয়? নাকি তারা সামান্য কিছু বিদেশী মুদ্রার লোভে একভাবে একটা অন্তত সংস্থাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন, তারা কি তথাকথিত 'ভগবান' রজনীশ সম্প্রদায়কে ভয় করেন? রজনীশের 'ভগবান' উপাধি সত্যই হাস্যকর (অবশ্যই সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন লোকেদের ক্ষেত্রে)। তবে আনন্দের বিষয় আমাদের দেশে দুর্বল মস্তিষ্কের লোকের সংখ্যা বোধহয় কম।

পল্লব, দীপঙ্কর, অমিমেষ, সুরজিৎ ও মানস 'ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাত্রাবাস'

॥ ৩ ॥

রজনীশদের সম্পর্কে ভারত সরকার একটু ভেবে দেখুন। সরাসরি এদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা হোক। এদের আশ্রমকে নিষিদ্ধ করা হোক। যদি সত্যিই ভারতীয় মানসিকতাকে অক্ষুন্ন রাখতে হয়, যদি ভারতের সনাতন আদর্শ বাঁচাতে হয় তবে রজনীশদের শিকড়শুদ্ধ তুলে ফেলা দরকার।

এম এস ইয়াসিন বাঁশপুর, হুগলী

॥ ৪ ॥

রজনীশ—প্রবন্ধটির জন্যে আন্তরিক অভিনন্দন। ভারতের বুকে যে এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে—সে সংবাদ পরিবর্তনের মাধ্যমেই প্রথম জানলাম। অবাক হলাম যে ভারত সরকারের সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারেই এই প্রতিষ্ঠানটি তার কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্ম যদি চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত—তাহলে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু পুনার পথে ঘাটেও নাকি এই প্রতিষ্ঠানের শিষ্যাশিষ্যাদের বেলেল্লাপনা করতে দেখা যায়। যৌন স্বাধীনতার এই আন্দোলন যদি ভারত সরকার দীর্ঘদিন অবাধে চালিয়ে যেতে দেন—তাহলে অদূর ভবিষ্যতে

এদেশের জনসাধারণ বিপথগামী হতে বাধ্য।

অজিতকুমার দাস, হাওড়া-৬

॥ ৫ ॥

রজনীশ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন : রজনীশ কি যৌন স্বাধীনতার নামে আদিম সভ্যতার জগতে মানুষকে ফিরে যেতে প্রেরণা দিচ্ছেন ? না কি আদিমবৃত্তিকে সুড়সুড়ি দিয়ে 'হীরো' সাজতে চাচ্ছেন ?

পৃথিবীর তাবৎ যৌনবিকৃতিগ্রস্ত রোগীদের জড়ো করে পাশবিক কায়দায় সাময়িকভাবে রোগীদের সুস্থ করে রজনীশ চুটিয়ে অর্থকরী ব্যবসা চালাচ্ছেন—এতে একাধারে স্বর্ণভাণ্ডের সম্ভার সংগ্রহ ও বর্তমানের অতৃপ্ত যৌনক্ষুধা নিবৃত্তি হচ্ছে। রজনীশ জানেন, ভারতবাসী ও ভারতকে নিয়ে এই নগ্ন ভেল্কীবাজি বেশি দিন চালানো অসম্ভব ; তাই, বিদেশীদের প্রতি তিনি ৯৫% নির্ভরশীল।

ভারতের পুরনো ইতিহাসে বহু অবতার বা ভগবানের পরিচয় মেলে—কিন্তু যৌন বিলাসী কোন ভগবানের সাক্ষাৎ মেলে না। শ্রীকৃষ্ণের গোপীবিলাসে একটু গন্ধ অবশ্য পাওয়া যায়। তবে কি ইনি কলির কৃষ্ণ ? না, তাকেও ডিঙিয়ে অন্য কিছু ? 'বাবা' আর 'মা' এর অভাব ভারতে নেই—বোধ হয়, সেই কারণে ইনি নবজাত রূপে এলেন।

প্রকাশ্যে রজনীশ যে ব্যবসা চালাচ্ছেন—তা ভারতবর্ষের সমাজজীবন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অশোভন ও অচল। সরকার একে ক্ষতিকারক জেনেও কেন বাধা দিচ্ছেন না ? সংবিধানের অপারগতার জন্যে ? মানবিক অধিকার ক্ষুণ্ণের অজুহাতে ? নাকি এদেরও হাত আছে দেশের জনগণকে ওদিকে ব্যস্ত ও বিভ্রান্ত রেখে কাজ হাসিলের আশায় ?

রজনীশ ফাউন্ডেশানের ক্রিয়াকলাপ হিপ্পি-ইজমের নবসংস্করণ। ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামোর বিষময় ফল একটি। এই রোগে আমেরিকা আক্রান্ত হোক—যা ইতিমধ্যে এই দেশে ভারত দেশজুড়ে চায় এবং এই বাসনা চরিতার্থকল্পে বিদেশী রাষ্ট্রযন্ত্র রজনীশ ও তার প্রতিষ্ঠানকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করছে। বিদেশী গুপ্তচরবৃত্তির এটি একটি অন্যতম ঘাঁটিও বটে। সুতরাং দেশের শাসনকর্তারাও যদি গদি আঁকড়ে রাখার একটা কৌশল রূপে রজনীশ ফাউন্ডেশানকে ব্যবহার করে থাকেন, তবে তার সুদূরপ্রসারী পরিণাম হবে অত্যন্ত জঘন্য—নিজের পায়ে কুড়ুল মারার সামিল।

বিংশ শতাব্দীর একজন মানুষ হিসেবে মনে করি, রজনীশের কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। প্রয়োজনে ভারত সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে যেন কুণ্ঠা না করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণে রাষ্ট্রসংঘ আছে।

মিলনেন্দু জানা

মানিকপাড়া, মেদিনীপুর

॥ ৬ ॥

সাংবাদিক শ্রীবিকাশকে অভিনন্দন। ভারতবর্ষের মতো রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংকট-সম্পন্ন দেশে রজনীশের মতো বিকৃত যৌন-মানস রাজনৈতিক ব্যবসায়ী থাকতেই পারে এবং এদের আকার পেলেই ঐ একই চরিত্রের আন্তর্জাতিক শক্তি কাজ করে থাকে। খুব সহজেই রজনীশের মতো 'সংক্রামক ধ্বংসের ঘা' একশ্রেণীর বিকৃতমন লোকের সাহায্যে গোটা সমাজকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলতে পারে। হতাশায় আচ্ছন্ন ভারতবর্ষের জনগণের সর্বপ্রথম এই সংক্রামক রোগের শিকার হতে পারে, যুবক-যুবতী সম্প্রদায়—অর্থাৎ সর্বনাশটা ভালোই হতে পারে।

রজনীশ প্রদত্ত বুদ্ধপ্রাপ্তির অঙ্কুর এই মুহূর্তেই ভারতের মাটি থেকে উৎখাত করা প্রয়োজন।

অরুণ চক্রবর্তী, নৈহাটি

শান্তিনিকেতন

'শান্তিনিকেতনের বিদেশী ছাত্র বহিষ্কৃত হল কেন ?' পড়লাম।

আমি বিশ্বভারতীর কৃষি বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র এবং '৭৭-'৭৮ বর্ষে বিশ্বভারতী ছাত্র সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক ছিলাম।

আপনার 'বিশেষ প্রতিনিধি' প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন "...শুধু সঙ্গীতের পাঠ নিতে আসেনি শান্তিনিকেতনের মনোহরণ করে বসেছে...।" এই কথাটির সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। আমার মতে বাইজানের ক্ষোভ এবং পরবর্তী কার্যকলাপের মধ্যে থেকে যে জিনিসটা আমি পরিষ্কার বুঝেছি তা হল, বাইজান কখনই শান্তিনিকেতনের সামাজিক জীবনের সঙ্গে মিশে যেতে পারেনি। যদিও অস্বীকার করি না একদল ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বাইজানের জনপ্রিয়তা ছিল, তা কিন্তু প্রমাণ করে না শান্তিনিকেতনের সমগ্র জীবনে একাত্মতা। যেমন কোন কোন ছাত্রছাত্রীর "রেস্টুরেন্টের মালিকের সঙ্গে হাসিতে খাওয়া বা জয়দেবের মেলায় হাতজুড়ে ধরা পড়া" প্রমাণ করে না শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য বা সংস্কৃতিকে।

বাইজানের সামনে প্রধান যে সমস্যা দুটি ('আমার মনে হয়েছে') শান্তিনিকেতনের জীবনে মিশে যাওয়ার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা হচ্ছে ওর চেহারা ও রীতিনীতি এবং অন্যটি হচ্ছে ভাষা সমস্যা। এর আগেও বহু বিদেশী ছাত্রছাত্রী শান্তিনিকেতনে এসেছেন ; তারা কিন্তু কেউই ওর মতো 'অন্য মানুষ' হয়ে ওঠেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বলতে ইচ্ছা করছে। বাইজান আমাকে একদিন গোল্ডেন্‌ বলে "I can kill ten Indians at a time". সুতরাং বাইজান কিন্তু কখনোই আমাদের একজন হয়ে উঠতে পারেনি। আর এটাই ছিল বাইজানের পরবর্তী কার্যকলাপের ভিত্তি।

প্রবন্ধের শেষে আপনারা এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের সাধের বিশ্বভারতীকে বিদেশের কাছে খেলো করার খেলা আর কতদিন চলবে ?' আমার প্রশ্ন এ ঘটনায় খেলো করার চেষ্টা আপনারা কোথায় দেখলেন ? বাইজান যে সমস্ত ঘটনাগুলো করেছে, তা কি কোন সভ্য সমাজ স্বীকৃতি দেবে ? আর কর্তৃপক্ষের এছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল বলে আপনারা মনে করেন নাকি ? একজন ভারতীয় ছাত্র মেয়েদের হোস্টেলে ঢুকে মেয়েদের ধরে টানাটানি করলে কোন কথা আপনারা কি লিখতেন ? বিদেশী ছাত্র হলে কি সভ্যতার মাপকাঠি বদলে যায় ?

আমি জানি একজন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বার করে দিলে দুঃখ হয়, তাই সুরেন ভকতের ব্যাপারের পর যখন কর্তৃপক্ষ বাইজানকে বহিষ্কার করতে চেয়েছিল, আমরা বাধা দিয়েছিলাম, কারণ আমরা মনে করেছিলাম ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে, সভ্য হবে। কিন্তু বাইজান হয়নি। তাই সভ্য দেশের সভ্য বিশ্ববিদ্যালয় বাইজানকে বার করে দিয়ে যে সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা কি অস্বীকার করা যায় ?

সবশেষে আপনাদের বলি ভালোর-মন্দর মেশানো এ দুনিয়া। বিশ্বভারতীও তার ব্যতিক্রম নয়। বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যেমন খারাপ ব্যাপার পাবেন, তেমনি একদল ছাত্রছাত্রী যে চেষ্টা চালাচ্ছেন এই অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের, তাও দেখতে পাবেন। তা হয়তো খুবই ছোট্ট আকারে, তবুও আছে।

আপনাদের মতো একটা বহুল প্রচারিত পত্রিকার কি কর্তব্য নয় সেই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বা বিশ্বভারতীর সুন্দর দিকগুলো তুলে ধরার ? রবীন্দ্রনাথ আপনার আমার সবার—সমস্ত বাঙালী তথা ভারতবাসীর গর্ব। বিশ্বভারতীর খারাপ দিকগুলো সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরি সুন্দর দিকগুলোর, তাহলেই গড়ে উঠবে সুস্থ সমালোচনা। তাহলেই প্রমাণ হবে আমরা বিশ্বভারতীকে ভালবাসি।

সব্যসাচী সরকার,

আসানসোল ৭১৩৩০১

॥ ২ ॥

"শান্তিনিকেতনের বিদেশী ছাত্র বহিষ্কৃত হল কেন ?" পড়লাম। লেখক বহিষ্কৃত ছাত্র জামেদ্‌ বাইজান (বাইজান) সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটি পেশ করিয়েছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে। শুধু বর্তমানের শান্তিনিকেতন সম্পর্কে আরও দু-চার কথা বলার আছে বলেই এ চিঠি।

শান্তিনিকেতনে অশান্তির কালো মেঘ দিন দিন ঘনীভূত হচ্ছে। আজকাল আশ্রমিক ছাত্রছাত্রীদের পোশাকে, আচার-আচরণে আশ্রমিক ভাবমূর্তি পরিলক্ষিত হয় না। বীরভূমের সংবাদপত্রগুলির পাতা উল্টালে সহজেই চোখে পড়বে যে, শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা কখনও ইলামবাজার বনে ফুর্তির মেলায় মত্ত, কখনো পৌষমেলার মেলায় বাইরে অন্ধকারে অসভ্যের ফেরারি হয়ে......কখনো সমাজ পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার। দুর্ভাগ্য একদিন যে মেয়েটিকে ভালোবেসে তার সঙ্গে মনের কথা আদান-প্রদান করছে—এখন সেই মেয়েটিকে শান্তিনিকেতনের ছাত্রটির বার কোন এক দৈহিক লোভের।

যারা দূর থেকে শান্তিনিকেতনকে দেখেন বা বৎসরান্তে একবার শান্তিনিকেতন দর্শন লাভে ধন্য হন তারা তো জানেন না—ছাত্রদেরা এই রবীন্দ্র তপোবনের প্রতিটি ইট, কাঠ, গাছ-পাতা এমন কি রবীন্দ্র প্রতিমূর্তি কি সব করুণ, জঘন্য ও নোংরা কাহিনীর নীরব দর্শক হয়ে আছে।

মেয়েদের হোস্টেলে ঢুকে ভাঙচুর আর শ্লীলতাহানির অভিযোগ নিয়ে আফগানিস্তানের ছেলে বাইজান ফিরে গেল। রবীন্দ্র তপোবনকে যে কলুষিত করতে চায় তার বিরুদ্ধে এই কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানাই ; সাধুবাদ জানাই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রককে। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত : বাইজান সম্পর্কে প্রশংস হবে। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে যদি বলি : তদন্তের মূল অর্থ আসল ঘটনাকে ধামা চাপা দেওয়া, তাহলে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না।

এ দেশ আর শান্তিনিকেতন সম্পর্কে কি ধারণা বুকে নিয়ে গেল বাইজান ? সে কেমন ছেলে ছিল ? সে হঠাৎ ঐ রকম আচরণ করলো কেন ? এমনি নানান প্রশ্ন এখন শান্তিনিকেতনের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

আবুল কালাম আজাদ, সাকড়া, বীরভূম

পিল

১৬ মার্চ সংখ্যায় ডাঃ জগদীশ ঘোষের 'পিল কতটা নিরাপদ' প্রতিবেদনটি পড়লাম। আমি নিজের জীবন দিয়ে কিছুটা উপলব্ধি করেছি এবং ডাঃ ঘোষের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একমত হতে পেরেছি।

বর্তমানে আমি প্রাকৃতিক উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করছি। পরিবর্তনের প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য জানাই, প্রাকৃতিক উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ হয় এবং হবে। চাঁদের গতির উপর নির্ভর করে জোয়ার-ভাটা, মেয়েদের মাসিকের পিরিয়ড প্রভৃতি। চাঁদের সঙ্গে শুক্রগ্রহের সম্বন্ধে এমন দিন ও সময় আসে যখন স্বাভাবিক মিলনে কোন ভ্রূণের সৃষ্টি হয় না। শ্রী কৃষ্ণমূর্তি জ্যোতিষ মতে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা প্রাকৃতিক উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আমি ও আমার মহিলাসমিতির সদস্যারা তিন বৎসর এই পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ করে আসছি। কলেজ স্ট্রিটে খুঁজলে এ বিষয়ে বই পাবেন। যদি এই ছোট্ট পত্র দ্বারা আপনাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকার উপকার হয়, নিজেকে ধন্য মনে করব।

কল্যাণী কুণ্ডু, সম্পাদিকা,

নিবেদিতা মহিলা সমিতি

॥ ২ ॥

১৬ মার্চ 'পরিবর্তনে' ডাঃ জগদীশ ঘোষের 'পিল কতটা নিরাপদ ?' পড়লাম। লেখক কেবলমাত্র পিলের ব্যবহারিক সাফল্য ও অপকারিতাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য জন্মরোধ বা পিল ছাড়া কি সীমিত পরিবার হতে পারে না?

সাধারণত মেয়েদের মাসের বিশেষ তারিখের আগে ও পরে এবং কোন কোন তিথি বা নক্ষত্র মেনে চললে অনিচ্ছায় মা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অনেক মেয়েরই এ নিয়ম অজানা। তাই তো আমরা অনিচ্ছায় পিলের শিকার হচ্ছি।

কবে আমাদের মত গরীব দেশে নির্ভরযোগ্য পিল আবিষ্কৃত হবে এই আশাতেই কি আমার মত বিবাহিতা মেয়েরা চুপচাপ বসে থাকতে পারছে ? তাই তো আমরা পিলের শিকার।

নিরোধ নামক কনডমের ওপর আমরা আস্থা হারিয়েছি। পিল আমাদের শত্রু। তাহলে আমাদের বন্ধু কি বড় বড় সাইনবোর্ডে অঙ্কিত নারসিং হোম ?

ডাঃ ঘোষের লেখা সময়োপযোগী হলেও সংক্ষিপ্ততার জন্যে সার্থক হয়নি। অব্যবস্থা ও ধ্বংসের পথ সম্বন্ধে উনি ভয় দেখালেন বটে, কিন্তু পরিত্রাণের রাস্তা দেখালেন না।

ডাঃ ঘোষকে আমার বিনীত অনুরোধ সুষ্ঠু পরিবার সীমিত রাখার জন্যে, তথ্যসহ বিস্তারিত লেখার জন্যে। আমার বিশ্বাস এতে পিলের শিকার সংখ্যা কমবে।

স্মৃতিকণা ঘোষ, মদনপুর

এবার কুড়ি টাকার সাম্মানিক পাবেন ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু।

অনিবার্য কারণে সাম্মানিকের টাকা পাঠাতে অনেক সময় মাস তিনেক লেগে যায়। অনুরোধ : অধৈর্য হবেন না।—সম্পাদক।

পরিকল্পনার ফলে সাধারণ মানুষের হাল কতটা ফিরেছে ?

সুদীপ মজুমদার

সব রাজনৈতিক দলই যা করে সে ভাবে নির্বাচনী প্রচারকালে কংগ্রেস (আই)-ও অনেক বড় বড় আশ্বাস দিয়েছিল। গত চার মাসে সে সব আশ্বাস মিথ্যা বলেই প্রমাণিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের অবস্থা শোচনীয় ; জিনিসপত্রের দাম লাগাম ছাড়া। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের হালচাল দেখে মনে হয় : সমস্যার পাহাড়ের মোকাবিলা করার চেয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে পছন্দসই লোক বহাল করে ক্ষমতার ভিতটাকে শক্ত করার দিকেই তার নজর বেশি। সম্প্রতি যে ভাবে যোজনা কমিশনের পুনর্গঠন করা হয়েছে তাতে এই সত্যই প্রকট হয়ে ওঠে।

আজ থেকে ঠিক তিরিশ বছর আগে এক সরকারী প্রস্তাবের মারফৎ যোজনা কমিশনের জন্ম হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং অন্যান্য নেতারা পরিকল্পিত পদ্ধতিতে দেশকে সর্বাঙ্গীন আর্থিক ও সামাজিক বিকাশের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূচনা করেন।

বিগত জনতা সরকারের আমলে যোজনা কমিশনের তৎকালীন ডেপুটি চেয়ারম্যান ডি টি লাকড়াওয়ালার তত্ত্বাবধানে ষষ্ঠ যোজনার খসড়া তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমান সরকার ঐ খসড়া বাতিল করে দিয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়। ঐ খসড়ার কপি-গুলিও নাকি ধীরে ধীরে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যোজনা কমিশন কোন খসড়া বা দলিল তৈরি করলে সাধারণত সরকার তা ছেপে কম পয়সায় বিক্রির ব্যবস্থা করেন যাতে ছাত্র, গবেষক কিংবা অর্থনীতিবিদরা সহজেই সেগুলি পেতে পারে। এখন তার উলটো প্রক্রিয়া চলছে। ষষ্ঠ যোজনার খসড়া জনতা আমলে তৈরি হয়েছিল বলে সেই মূল্যবান দলিলটির খসড়া লোকচক্ষুর অগোচরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, বিগত কমিশনের একজন সদস্যকেও অনেক কষ্ট করে ঐ দলিলের একটা কপি জোগাড় করতে হয়েছে।

আপাতত কমিশন চলছে দুইজন সদস্য মনমোহন সিং ও মোহম্মদ ফজল,আর অ্যাকটিং ডেপুটি চেয়ারম্যান এম এস স্বামীনাথনকে নিয়ে। এদের নিয়োগ করেছেন ইন্দিরা সরকার। আগের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রীলাকড়াওয়ালা ইস্তফা দিয়েছিলেন নতুন সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হয় ১৯৫৬ সালে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মেয়াদ শুরু হয় ওই বছরেই। এই দ্বিতীয় পরিকল্পনাই ভারতের পরিকল্পিত বিকাশের ভিত বলে পরিগণিত হয়। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন অর্থনীতিবিদ পল বারন-এর মত ব্যক্তিরা ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনার কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালের ২ মে-র এক বৈঠকে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ (National Development Council) এক প্রস্তাব পাশ করেন। দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষীয় পরিকল্পনার খসড়া পড়ে পর্ষদ বলেন—"Relying on the enthusiasm and support of the people, the Council calls upon all the citizen of India to work whole-heartedly for the full and timely realisation of the tasks, targets and aims of the Second Five Year plan." এখানে 'জনসাধারণের উৎসাহ ও সহযোগ-এর উপর ভরসা করে' কথাগুলো লক্ষ করার মত। 'জনসাধারণের উৎসাহ' যে বহুদিন আগেই উবে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। আর সহযোগিতা? তার অপেক্ষা কি কোন কেন্দ্রীয় সরকার করছেন? আজ-কালতো মৌখিক পাটও চুকে গেছে।

প্ল্যানিং কমিশনের কাজ হল দেশের সম্পদ, চাহিদা, উৎপাদন, বিতরণ, পরিবহন ইত্যাদি নানান বিষয়ের সমীক্ষা করা, হিসেব নিকেশ করা ও আগামী দিনের দিকে নজর রেখে বিভিন্ন বিকাশ সংক্রান্ত পরিকল্পনা তৈরি করা—এক কথায় সরকারকে অর্থ-নৈতিক বিকাশের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া। অতীতের কাজ ও ভবিষ্যতের চাহিদা সামনে রেখে প্ল্যান তৈরি হয়। এতে বেকারত্ব, দারিদ্র্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা সবকিছুই আলোচনা করা হয়।

প্ল্যানিং কমিশনের তৈরি পরিকল্পনার অবশ্য সরকারী বিল বা অ্যাকটের মত আইনগত জোর নেই তবুও একে মেনে নেওয়ার প্রথাই চলে আসছে বহুদিন ধরে। পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব বর্তায় সরকারী এজেন্সির উপর। তাই প্ল্যানিং কমিশন যত ভাল পরিকল্পনাই করুক না কেন, যদি যথাযথ কাজ না হয়, তাহলে তা অর্থহীন হয়ে পড়তে বাধ্য।

কমিশন প্রথমে একটি স্বাধীন ও ক্ষমতা-শালী সংগঠন হিসাবে শুরু হয়। প্রথম ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন ভি টি কৃষ্ণমাচারী।

চেয়ারম্যান সর্বদাই প্রধানমন্ত্রী। উদ্দেশ্য কমিশনের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সরকারী নীতির যোগসূত্র রাখবেন প্রধানমন্ত্রী। মাঝে মাঝে অর্থনৈতিক বিকাশের দলিল তৈরি করা ছাড়াও কমিশন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করত। তা হল কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মাঝে মধ্যস্থতা। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ঝগড়া দেখা দিলে অতীতে কমিশন কখনও কখনও মিটমাট করার কাজে সাহায্য করেছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা প্ল্যানিং কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে নিজ নিজ রাজ্যে বিকাশের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করার পর National Development Council-এ মিলিত হন। কাউন্সিলের মিটিং হয়

প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে। সেই মিটিং-এ বিভিন্ন রাজ্যের প্ল্যান চূড়ান্ত করা হয়। সেখানেও প্ল্যানিং কমিশন মধ্যস্থতা করে। এ যাবৎ রাজ্য সরকারগুলো NDC এর মিটিঙে কেন্দ্রের একাধিপত্য মুখে এসেছে। কিন্তু অবস্থা পালটে গেছে এ বছর এখনো NDC-এর মিটিং ডাকাই হয়নি।

কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে এমন একটি সংস্থা থাকা চাই যা সরকারী সম্পদের হিসেব নিকেশ রাখবে। শুধু তাই নয়, কি করে পাবলিক সেকটারে শিল্প বিকাশ ঘটবে তারও দিক নির্দেশ চাই। এখন ২০,০০০ কোটি টাকারও বেশি নিয়োজিত রয়েছে বিভিন্ন সরকারী উদ্যোগে। তার মধ্যে আছে কয়লা, ইস্পাত, তাপবিদ্যুৎ, রেলওয়ে ইত্যাদি। প্ল্যানিং কমিশন সেই দিক নির্দেশের সংস্থা রূপে কাজ করবে বলেই ভাবা হয়েছিল। বোঝাই যাচ্ছে কি দারুণ গুরুত্ব এই কমিশনের। বিশেষজ্ঞরা খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে মাঠে ময়দানে রিসার্চ করে তথ্যের ভাণ্ডার ভরে তোলেন। তারই ভিত্তিতে হিসেব করা হয় আর প্ল্যান তৈরি করা হয়।

পরিকল্পনা রচনার জন্য প্ল্যানিং কমিশনের নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও সক্রিয় ভূমিকা থাকা দরকার। কিন্তু গত তিন-চার বছরে কমিশনের চৌহদ্দিতে যে সব কাণ্ড ঘটেছে তাতে নানান প্রশ্ন জাগে।

একথা বললে ভুল হবে যে যোজনার মাধ্যমে কোন উন্নতিই হয়নি। আর্থিক দিক থেকে এখন পৃথিবীতে ভারতের স্থান নবম। শিল্প উৎপাদনের বেলায় দুনিয়ায় ১৩ নম্বর। প্রযুক্তিবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক ক্ষমতায় প্রায় ইটালীর সমকক্ষ। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও উন্নত ও সামরিক যন্ত্রপাতি ভারত নিজেই তৈরি করার ক্ষমতা রাখে। এদেশ থেকে ট্রানজিসটর, টি ভি রপ্তানী হচ্ছে। ভারতের সুতীর জামা কাপড় বিশ্বের বাজারে উচ্চাসনে বসেছে। আমাদের দেশ অনেক দেশকেই প্রযুক্তিবিদ্যা দিয়ে সাহায্য করতে পারে।

শস্য উৎপাদনের পরিমাণও বেড়েছে অনেক। কয়েকবছর ধরে আমদানী করার দরকার পড়ছে না। ড্যাম তৈরি হয়েছে। দ্রুতবেগে রেল চলছে। মাটির তলায়ও রেল চলবে। এসব প্ল্যানিং করার তিরিশ বছরে হয়েছে।

কিন্তু আজও শতকরা চল্লিশ জন দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না এদেশে। দারিদ্র্যের এমন ভয়ঙ্কর রূপ পৃথিবীর খুব কম দেশেই দেখা যায়। কুসংস্কারের কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। শুধু পেটের রোগ আর বুকের দোষে ভুগছে কত লক্ষ মানুষ তার ঠিক নেই। গ্রামের পর গ্রামে এক ফোঁটা শোধিত পরিষ্কার পানীয় মেলা ভার। যে সব শিল্প গড়ে উঠেছে সেগুলিও বিদ্যুতের অভাবে ভেঙে পড়ার মুখে। শুধু তাই নয়; সারা বিশ্বের উৎপাদনে ভারতের অংশ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। ১৯৫০ সালে বিশ্বের মোট বাণিজ্যের শতকরা দুই অংশ ভারতের। আজ তা মাত্র শতকরা আধ।

অথচ প্রাকৃতিক সম্পদে ভারত বেশ ধনী। সারা পৃথিবীর আকরিক লোহের ১০% রয়েছে এদেশেই। কয়লাও পর্যাপ্ত। আছে অসংখ্য জলপ্রপাত, বড় বড় নদী, পাহাড়, জঙ্গল। তাতে প্রচুর সম্পদ। এ সবের হিসেব নিকেশ আছে প্ল্যানিং কমিশনের নানান গবেষণায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্দশার অন্ত নেই। বিশেষত গরিবের। কেননা এদেশের রাজনৈতিক নেতারা কোনও দিনই সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা মোচনের প্রকৃত চেষ্টা করেননি।

দেশের সব চেয়ে বড় সম্পদ তার মানুষ। মানুষই সব বিকাশের নিয়ন্তা। কিন্তু আমাদের দেশের প্ল্যানিং প্রক্রিয়ার সাথে সাধারণ মানুষের কোনও যোগাযোগ নেই। থাকলে প্রতিদিন মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যেত না। এখন ২৩ শতাংশ হারে মুদ্রাস্ফীতি চলছে; তা যদি চলতেই থাকে, তাহলে ক্রয় ক্ষমতা শুধু মাত্র এক মুঠো বড়লোকের হাতেই থেকে যাবে। বিগত পরিকল্পনাগুলোতে বেশি চাকরি দেবার কথা বলা হয়েছিল। কার্যত কতটুকু হয়েছে? যাদের হাতে কটা পয়সা এসেছে তারাও নুন তেল কিনতেই ফতুর।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্ল্যানিং কমিশনের পুনর্গঠনের ব্যাপারটা দেখা যাক। যাদের সদস্য পদে বসানো হয়েছে তাদের যোগ্যতার থেকে নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্যকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মনমোহন সিং লব্ধপ্রতিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ। তাকে মেম্বার-সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ তার বেশির ভাগ সময়ই কেটে যাবে প্রশাসনের কাজ দেখতে।

এক সময় প্রোফেসর সুখময় চক্রবর্তীর মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ যোজনা কমিশনের সদস্য হিসাবে কাজ করেছেন। কাজ করেছেন ডি আর গাডগিল যার 'গাডগিল ফরমুলার' কথা অনেকেরই মনে আছে। ভারতবর্ষে যে যোগ্য অর্থনীতিবিদ বা বিশেষজ্ঞের অভাব আছে তা নয়। আসলে স্বাধীনচেতা মনোভাবসম্পন্নরা কিছুতেই সরকারের লাঠি ঘোরানো বরদাস্ত করতে চান না। তাই তারা প্ল্যানিং কমিশনের মত সংস্থায় যোগদান করতে রাজি নন।

নতুন সরকার ঘোষণা করেছেন— মোরারজীর আমলের 'রোলিং প্ল্যান' শিকেয় উঠবে। কদিন আগে ঘোষণা করা হয়েছে— আড়াই বছরের পরিশ্রমে ষষ্ঠ যোজনার যে খসড়া তৈরি করা হয়েছিল তা বাতিল করে দেওয়া হবে। শ্রীমতী গান্ধী ঘোষণা করেছেন ষষ্ঠ যোজনা নতুন করে ঢেলে সাজান হবে ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৪-৮৫ সালের জন্য।

প্ল্যানিং কমিশনকে এমনভাবে সাজানো হচ্ছে যাতে ক্যাবিনেট থেকে যা বলা হবে তাই যেন কমিশন করে যায়। কিন্তু কমিশনে এ পর্যন্ত যে সব মৌলিক গবেষণা করা হয়েছে তার কি কোন দামই নেই? প্ল্যান না হয় বদলাক; কিন্তু তা বলে যে সব তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্ল্যান তৈরি হবে তাও কি বদলান দরকার?

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কয়েকদিন আগে কলকাতায় এক ভাষণে বলেছেন— রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আর প্রাদেশিক মনোভাব প্ল্যানিং কমিশনের কার্যকলাপকে প্রভাবিত করছে। তিনি বলেন— পশ্চিমবঙ্গ ক্রমেই অবহেলার শিকার হয়ে পড়ছে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র কয়েক সপ্তাহ আগে দিল্লিতে সাংবাদিকদের বলেন— কেন্দ্রীয় সরকার কোন পথে চলছেন কী অর্থনৈতিক পন্থা অনুসরণ করছেন—তার কোনও হদিশই নেই রাজ্য সরকারগুলোর কাছে। নতুন পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় কী কী বিশেষত্ব থাকবে সে সম্বন্ধে অনেকেই এখনও অজ্ঞ।

আগেই বলেছি: কংগ্রেস (আই) দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি আর বাস্তব ক্রিয়াকলাপে অনেক ফারাক দেখা দিয়েছে। আদর্শ হয়ত ঠিকই আছে কিন্তু তার যথাযথ প্রয়োগ কই? পরিকল্পনা রচনার সময় সাধারণ মানুষের অবস্থা ফেরানোর কথাটা আন্তরিকভাবে ভাবা দরকার। তা না হলে সব সুন্দর পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত কাগজে প্রতিশ্রুতি মাত্র হয়ে পড়ে থাকবে। ★



পথ চলতি

নিবারণ চক্রবর্তী

শেয়ালদা-লালগোলা সেকশানে যারা ট্রেনভ্রমণ করেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের কিছু গান শুনতে হয় অন্ধ ভিখারি সম্প্রদায়ের কণ্ঠে। এদের কণ্ঠ কচিৎ সুশ্রাব্য, বেশির ভাগই 'চীৎকৃত সংগীতহীনতা।' 'আমার সাধ না মিটিল' ধুয়োর বাঙালির জাতীয় সংগীতটি আগে খুব শোনা যেত। বছর কয়েক ধরে ট্রেনের 'হিট সং' : 'পথের ক্লান্তি ভুলে স্নেহভরা কোলে তব' গানটা শুনলে প্যাসেনজারদের পথের ক্লান্তি বেড়ে যায় এবং তারা অনুক্ত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে 'কত দূর, আর কত দূর?' অর্থাৎ কতদূর গেলে এই গানের গুঁতো শেষ হবে।

এইসব Gun আর ভিড় আর ধাক্কা আর লেট ট্রেনের মধ্যে হঠাৎ একেক দিন অলৌকিক কিন্নরের মত কামরায় উঠে আসে সহদেব সাহা। নিবাস মদনপুর। সিঙ্গল রিড হার্মোনিয়ামের একমুখী সুর লুটিয়ে পড়ে সুরের আর্তি : 'মনে রবে কিনা রবে আমারে' ট্রেনের কামরায় রবীন্দ্রসংগীত এবং নিখুঁত সুর এ লাগে। যেন ভাদ্রের গুমোটে ফাল্গুনী হাওয়া।

জানতে ইচ্ছে করে কেমন করে অন্ধ সহদেব শিখলো রবীন্দ্রনাথের গান আরও কতগুলো গান জানে, কেন বেছে নিলো ঐ গানটা? আপাতত এ প্রশ্ন অবান্তর। কেননা গত একবছর সহদেবের হার্মোনিয়ামটি খারাপ হয়ে আছে। সে খালি গলায় ছন্দ রেখে বলছে 'বোম বোম তারক বোম' আর ভিক্ষাপাত্র বাড়াচ্ছে। কে সারিয়ে দেবে সহদেবের যন্ত্র ফিরিয়ে দেবে তার গলায় রবীন্দ্রগীতের বেদনাভরা ঐশ্বর্য?

এ দেশে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষক অধ্যাপন হয় হাজার হাজার টাকা ব্যয়ে, নামী রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী এক সন্ধ্যায় দক্ষিণা নেন তিন হাজার, কিন্তু সহদেবদের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গানের জগৎ আর ফেরে না



' মনে রবে কি না রবে আমারে '

রবীন্দ্রনাথ অনন্য কিন্তু তিনি যে কি অসাধারণ কথা বলতে পারতেন তার যৎসামান্যই ধরা আছে কোন কোন প্রত্যক্ষদর্শীর গ্রন্থে

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যথেষ্ট মেলামেশা, ও ঘোরাফেরা করেছেন এমন একজনকে পাকড়াও করে সেদিন বললাম : রবীন্দ্রনাথের কথা-বার্তার কিছু নমুনা বলবেন?

স্মৃতির অতলে ক্ষণিক ডুব দিয়ে ভদ্রলোক উদভাসিত মুখে বললেন : শোনো তবে। সেবার রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের নাচগানের দল নিয়ে এসেছেন কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনসটিটিউটে। নৃত্যনাট্য অভিনয়ের আগে কুশীলবরা মেক-আপ নিচ্ছে, গুরুদেব বসে আছেন ডেকচেয়ারে কলকাতার বিশিষ্ট রবীন্দ্রভক্তরা তাঁকে ঘিরে গল্পগুজব করছেন। হঠাৎ একজন উদ্যোক্তা এসে গুরুদেবকে বললেন : গুরুদেব চা খাবেন তো?

রবীন্দ্রনাথ নিমেষে উত্তর দিলেন : চা? না গো, আমি না চায় দলে

আমরা তো অবাক! নাচের দল এনেছেন বলে কেমন কায়দা করে জানালেন তিনি নাচায় দলে ও না চায় দলে। তাই শুনে এক নব্যযুবক ইংরিজিতে বলে উঠল : স্ট্রেঞ্জ! ইউ ডোনট টেক টি?

রবীন্দ্রনাথ এবারে বললেন : হ্যাঁগো, আমি নটির। No Tea। দলে।

বর্ধমান লোকালে নিত্যযাত্রী অধ্যাপক বললেন, রবীন্দ্রনাথের গানের এক একটা লাইন নিয়ে খুব মজার ব্যাখ্যা করা যায় যেমন ধরো, কেউ বলতে পারে, একবার রবীন্দ্রনাথকে ভয়ংকর এক ডাকাত কাপড়ে ধরেছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন বলে উঠেছিলেন : 'হা রে রে রে রে রে আমায় ছেড়ে দে রে দে রে।'

ঘটনাটা শুনে বৃশ্চপন্থী সহযাত্রী বললেন 'আর জানেন তো রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই ফোরকাস্ট করেছিলেন তিব্বত সম্পর্কে : 'একদিন চিনে (চীনে) নেবে তারে।'

একজন অনুসন্ধিৎসু বললেন, 'রবীন্দ্র-সংগীতে লোডশেডিং সম্পর্কে কিছু নেই?'

: এক ঝুড়ি। শুনুন তাহলে। 'আর রেখো না আঁধারে, আমায় দেখতে দাও', 'যতবার আলো জ্বালাতে চাই নিভে যায় বারে বারে', 'একি এলো একি এলো না বোঝা গেল না', এ দেখ দিয়ে যে চলে গেল' এবং রবীন্দ্রনাথের শেষ সিদ্ধান্ত, আমাদের মতই 'আমার আঁধার ভালো'।

মিন মিন করে রাজ্য সরকারি কর্মচারি বললেন : আমাদের সম্পর্কে কবিগুরুর গানটা কি ভুলে গেলেন? এই যে কেন্দ্রের ডি এ বেড়েই চলেছে এই যে পে-কমিশন রিপোর্ট বেরোচ্ছেই না, এই যে অনবরত ট্রানসফার সে বিষয়ে গুরুদেবের গানই একমাত্র সান্ত্বনা গুনগুন করলেন : আরো আরো প্রভু আরো আরো এমনি করে আমায় মারো



' যতবার আলো জ্বালাতে চাই নিবে যায় বারে বারে '

ব্যঙ্গচিত্র : লাহিড়ী

ঠাকুর পরিবারের লোকেরা জমিদার হিসাবে কেমন ছিলেন

অজয় বিশ্বাস

ঠাকুর এস্টেট।

ঠাকুর পরিবারের জমিদারী বললেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে পদ্মার ঢেউয়ে ভেজা শিলাইদহের ছবি, হানিফ চাচার ঘাটে বাঁধা পদ্মাবোট, কুঠিবাড়ি···আর সব সব ছাপিয়ে সেই একজনের কথা : নিজের কীর্তির চেয়েও যিনি মহৎ সেই মহাকবির কথা।

'ঠাকুর' শব্দটার সঙ্গেই যেন আমাদের এমনি সব নসটালজিক অনুভূতি সংপৃক্ত হয়ে আছে। হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে অনীহা আমাদের চিরদিনই। তাই জমিদার হয়েও ঠাকুরবাবুরা এক ভিন্নতর পটভূমিতে আসীন থেকেছেন আমাদের ইতিহাসবেত্তাদের চোখে। আর সেইজন্যেই জমিদার ঠাকুরবাবুদের ভূমিকার উপর আলোকপাত হয়নি বিশেষ। অনেকটাই থেকেছে আবছা।

কিন্তু কেমন মানুষ ছিলো তাঁরা? প্রজাদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কই বা কেমন ছিল?

এইসব প্রশ্নের জবাব খোঁজার আগে আরও একটু অতীতে পাড়ি জমাতে হয়—লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামে তিনিই এক নতুন শ্রেণীর জন্মদান করেছিলেন বৃটিশ রাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির গোড়া পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা ওঠানোর তাগিদে।

তাঁর নিজেরই কথায়, 'আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ভূস্বামীগণকে আমাদের সহযোগী করিয়া লইতে হইবে। যে ভূস্বামী একটি লাভজনক ভূসম্পত্তি নিশ্চিন্তমনে ও সুখে শান্তিতে ভোগ করিতে পারে তাহার মনে উহার কোনরূপ পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগিতেই পারে না।' (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলার কৃষক/বদরুদ্দিন ওমর)

ভূসম্পত্তি যে লাভজনক এই সার কথাটি ইংরেজদের এদেশি বেনিয়ানেরা বুঝতে পেরেছিলেন। তাদের সঞ্চিত বিপুল বিত্ত তারা ভূসম্পত্তি কেনার কাজে লাগাতে শুরু করেন। ১৭৯৩ এর 'সেল ল' (Sale Law 1793) এর খাঁড়ার ঘায়ে যখন ছোট ছোট জমিদারী বিক্রি হতে শুরু হয় তখন যেসব পরিবার এই-সব ভূসম্পত্তি কেনায় মনোনিবেশ করেছিলেন কলকাতার ঠাকুর পরিবার তাদের অন্যতম।। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশের অন্যতম কৃতী-পুরুষ দ্বারকানাথ মাত্র ১৬ বছর বয়সেই পাবনা, বিরাহিমপুর, কটক এবং বালিয়া জেলার জমিদারীর মালিক হন। এই সময় মাসিক রাজস্ব মিলতো তিরিশ হাজার টাকা। সে আর এক অধ্যায়।

এই নতুন জমিদাররা জমিদারীর মালিক হয়েই রায়তের ঘাড়ে নতুন করের বোঝা চাপিয়ে দিতেন, বাড়তি কর আদায়ের জন্যে অমানুষিক অত্যাচার করতেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত এই অত্যাচারের একটা তালিকা : ১) দণ্ডাঘাত ও বেত্রাঘাত, ২) চর্ম পাদুকা প্রহার, ৩) বাঁশ ও কাঠ দিয়ে বক্ষস্থল দলন, ৪) খাপরা দিয়ে নাসিকা কর্ণ মর্দন, ৫) মাটিতে নাসিকা ঘর্ষণ, ৬) চুলের ধরে বেঁধে রাখা···(সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র/২য় খণ্ড/বিনয় ঘোষ)

অন্য জমিদারদের সঙ্গে ঠাকুরবাবুদের কোন পার্থক্য ছিল কি? বাড়তি কর আদায়ের জন্যে তাঁরাও কি বেআইনী পথের আশ্রয় নিতেন? রমেশচন্দ্র দত্ত 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' (১৪.৯.১৮৭৩) এই সব জমিদারদের প্রসঙ্গে লিখেছেন · 'বন্দ্যোপাধ্যায়েরা তাদের রায়তদের কাছ থেকে কবুলিয়ত লিখিয়ে নিয়েছেন যার শর্ত রায়তদের পক্ষে খুবই মারাত্মক। আমার কোন সন্দেহ নেই যে অন্য জমিদারেরাও এই বন্দ্যোপাধ্যায়দের উদাহরণই অনুসরণ [illegible]'

আর এই সন্দেহ যে সেই সময়ের বৃটিশ প্রশাসনিক কর্তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি সিরাজগঞ্জের সহকারী জেলাশাসক পিটার নোলানের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে লেখা চিঠিই তার প্রমাণ। ১৮৭৩ এর ১ জুলাই পিটার নোলান পাবনার জেলাশাসকের কাছে পাঠানো রিপোর্টে লিখেছেন, 'ঠাকুর পরিবার প্রথমে টাকা প্রতি আট আনা এবং পরে টাকা প্রতি চার আনা কর বাড়াতে চেয়েছেন। কিন্তু করের বোঝা এমনিতেই অত্যধিক। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার কবুলিয়তের কথা বলেছেন : এর শর্ত অনুযায়ী জমিদার নির্ধারিত সবরকম কর দিতে রায়ত বাধ্য থাকবে। কবুলিয়তের আরও একটি শর্ত অনুযায়ী জমিদার তার ইচ্ছা অনুসারে রায়তকে উচ্ছেদ করতে পারবে., রায়ত তার পৈত্রিক সম্পত্তিতেই যথেচ্ছ কর দিতে বাধ্য থাকবে।'

এই জমিদারদের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য, 'আমার কাছে আইনানুগ ভাবে যেসব ঘটনা নথিবদ্ধ হয়েছে এবং তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসফশাহীর জমিদারেরা অত্যন্ত দাঙ্গাবাজ প্রকৃতির। এদের কাছে আইনের কোন মূল্য নেই, মূল্য নেই রায়তের জীবনের। নিজেদের মধ্যে দাঙ্গার সময়েও এরা জীবনের তোয়াক্কা করে না!'

নাটোরের মহারাজার ইসুফশাহী পরগণার জমিদারী বকেয়া খাজনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেলে যে পাঁচটি পরিবার এই জমিদারী কিনে নেন কলকাতার ঠাকুর পরিবার তাদের অন্যতম।

ঠাকুরবাবুরা জমিদারী পরিচালনা করতেন কলকাতায় থেকে ম্যানেজার এবং এজেন্টদের সাহায্যে। শাহজাদপুর, উমরপুর, কামিরতা, তাঁদের জমিদারী মহাল ছিল ভাবতে অবাক লাগে, যে শাহজাদপুর পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-



প্রজাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

নাথের সৃষ্টিকে অনুপ্রাণিত করেছে, সমৃদ্ধ করেছে, সেই শাহাজাদপুরেরই দারিদ্র্যক্লিষ্ট শীর্ণ মানুষগুলিকে একদিন তাঁর পরিবারের শোষণ নিষ্পেষণে জর্জরিত হতে হয়েছে। জমিদারী শ্রেণীস্বার্থে আঘাত পড়লেই প্রিন্স দ্বারকানাথের উত্তরসূরীরা অনেক সময় ফুঁসে উঠেছেন। কবি দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ কিংবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিষয় বিরাগী চিত্তেও জমিদারী স্বার্থেলা চাঞ্চল্য জাগত। এই চাঞ্চল্যের ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই :

'পাবনা জেলার শাহাজাদপুর থেকে আমাদের পারিবারিক জমিদারীর ম্যানেজার আমাকে জানিয়েছেন যে, আমাদের জমিদারী এবং সংলগ্ন অন্য জমিদারী এলাকার রায়তেরা অত্যন্ত দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে। তাদের অত্যাচারে জীবন, সম্পত্তি এবং সম্মান রক্ষা করাও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, যে কোন জায়গায় যে কোন মুহূর্তেই বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হওয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জরুরী কর্তব্য। নতুবা আগুন যা ছোট্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ তা আরও বিস্তৃতি লাভ করবে।

আমার জমিদারীর ম্যানেজার এবং এজেন্টরা ইতিমধ্যেই জেলাশাসকের সাহায্য প্রার্থনা করে আবেদন করেছেন। আমিও মহামান্য লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে এই মর্মে আর্জি পেশ করেছি। তিনি নিশ্চয়ই পাবনা জেলার এই অস্থির পরিস্থিতির দিকে নজর দেবেন। দুষ্কৃতিকারী রায়তেরা যেসব নির্দোষ, দুর্বল ও নিরীহ মানুষকে হিংসাত্মক হুমকী দিচ্ছে তাদের জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, (Bengal Judicial Proceedings (Police) July 1873)।

'দুর্বিনীত' প্রজাদের বিরুদ্ধে বিদেশী শাসকের কাছে দমন নীতি প্রয়োগের এই আবেদন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। এই আবেদন-পত্রের বয়ান যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুমোদন পেয়েছিল সে ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ কম। কারণ তিনিই তখন ঠাকুর এসটেটের একমাত্র স্বত্বাধিকারী।

কিন্তু প্রজাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কতটা সত্যি ছিল? তারা কি সত্যিই হিংসাত্মক ঘটনার সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছিল? এসব জিজ্ঞাসার জবাব মিলবে মিঃ নোলানের মন্তব্য : 'বিদ্রোহের মূল কারণ হল ইসুফশাহী পরগণায় যখন তখন ইচ্ছে মত কর বাড়ানো এবং বেআইনীভাবে জোর করে তা আদায় করা।' (রমেশচন্দ্র দত্ত/বেঙ্গল ম্যাগাজিন/১৪.৯.১৮৭৩)

এর বিরুদ্ধে একজোট হয়ে প্রতিরোধের প্রাচীর তুলেছিলেন, তুলতে বাধ্য হয়েছিলেন পাবনার কৃষক সমাজ। এই সংঘবদ্ধ প্রতিরোধকে বৃটিশরাজের দমন নীতি দিয়ে ভাঙতে সচেষ্ট হয়েছিলেন অন্যান্য জমিদারদের মত ঠাকুরবাবুরাও। আর তাঁদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল হিন্দু প্যাট্রিয়ট, অমৃতবাজারের মত পত্রিকা। বিক্ষুব্ধ রায়তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে ৫ জুলাই ১৮৭৩, অমৃতবাজার জানাল :

Villages after villages have been plundered and in some cases murders have been committed. But what has shocked us above all is the manner in which these frenzied boors have maltreated the females of the respectable family ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইসব অভিযোগের ফিরিস্তি যে নেহাতই কল্পনাপ্রসূত সে কথা পরিষ্কার লিখে



দ্বারকানাথ ঠাকুর

গিয়েছেন মিঃ বাকল্যান্ড,'··· খুন এবং অন্যান্য অত্যাচারের ঘটনার কোন ভিত্তি নেই। এই গোলমালের সময় গোটা সিরাজগঞ্জ মহকুমাতেই কেউ সাংঘাতিকভাবে আহত হয়নি। কোন জমিদারের কুঠী কিংবা কাছারীও আক্রান্ত হয়নি···'(C. E. Buckland, CIE, *Bengal under the Lieutenant Governors*, Page 544)।

বিদ্রোহী রায়তদের বিরুদ্ধে লুঠতরাজ এবং দুটি ক্ষেত্রে মহিলা ধর্ষণের অভিযোগ এনেছিলেন ঠাকুর জমিদারীর আমলারা। সিরাজগঞ্জ মহকুমার সহকারী জেলাশাসকের দফতরে সেই অভিযোগ নথিবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তদন্তের ফলে যে সত্য প্রকাশিত হল তা আরও চাঞ্চল্যকর। লুঠতরাজের পুরো ঘটনাই অতিরঞ্জিত এবং মহিলাদের বলাৎকারের ঘটনার সঙ্গে ঠাকুর-পাকড়াশী দুই পরিবারের পারস্পরিক রেষারেষি জড়িত; রায়তদের সঙ্গে এই দুই ঘটনার বিন্দুমাত্র সংযোগও ছিল না।

নিজের জমিদারীর প্রজাদের বিরুদ্ধে ঠাকুর বাবুদের এই মিথ্যাচার সম্পর্কে পিটার নোলান তাঁর তদন্ত রিপোর্টে লিখেছেন, 'ঠাকুর জমিদারের অভিযোগ পেয়ে জামিরতায় গিয়েছিলাম। সেখানে নাকি বেশ কয়েকটি লুঠ এবং দুটি নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু আমি দেখলাম ঘটনা নেহাতই অতিরঞ্জিত। এর সঙ্গে 'বিদ্রোহী' আন্দোলনের সম্পর্ক নেই। পুরো ঘটনাই পাকড়াশী পরিবারের সঙ্গে পুরনো বিবাদের পরিণতি।' (BJPP, July 1873, File 448/Diary of P.Nolan, 4 July 1873)

মিথ্যে অভিযোগের গালগল্প ফেঁদে বৃটিশ শাসকের দমন নীতি দিয়ে বিক্ষুব্ধ প্রজাদের শায়েস্তা করার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রস্তুতিও চলছিল। ঠাকুরবাবুরা বাড়তি খাজনা জোর করে আদায়ের জন্যে একটি শিখ বাহিনীও তৈরি করেছিলেন। ৮ জুলাই ১৮৭৩ পিটার নোলান তার ডায়েরিতে লিখেছেন, '···আমি পুলিশকে এদের গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলেছি, যদি তারা গ্রামের বাইরে যায় এবং দাঙ্গায় প্ররোচনা দেয় তাহলে বলেছি তাদের গ্রেফতার করে চালান দিতে···'

পাবনার প্রজাবিদ্রোহের এই দিনগুলিতে জমিদার ঠাকুর পরিবারের যে রূপ প্রকাশিত হয়েছিল তার সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায়, পাকড়াশী কিংবা আর পাঁচটি জমিদারের আচার আচরণ অত্যাচারের তফাৎ ছিল না। কিন্তু এত করেও প্রিন্স দ্বারকানাথের উত্তরসূরীরা তাঁর বিপুল বিষয়-আশয়কে টিকিয়ে রাখতে পারেননি। দেবেন্দ্রনাথের সময় থেকেই তার নিম্নগামিতার শুরু···

ঠাকুর বংশ।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার বলতেই বিপুল ঐশ্বর্য আর বৈভবের সঙ্গে সংপৃক্ত যে নামটি সবার আগে মনে পড়ে তা হল প্রিন্স দ্বারকানাথ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমিন জয়রাম ঠাকুরের বড় ছেলে নীলমণি কটকের নিমক মহালের মালিকানার সূত্রে প্রচুর অর্থোপার্জন করেন। তিনিই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

নীলমণি ঠাকুরের বড় ছেলে নিঃসন্তান রামলোচন মেজো ভাই রামমণির চার বছরের ছেলে দ্বারকানাথকে দত্তক নেন ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে। মাত্র ষোল বছর বয়সেই তিনটি জমিদারী মহালের মালিক হয়ে দ্বারকানাথ তাঁর বিষয়বুদ্ধির পরিচয় দেন।

সেই শুরু।

১৮২৩ সালেই তিনি চব্বিশ পরগণার কালেক্টর এবং নিমকি দেওয়ান নিযুক্ত হলেন ১৮২৮ ম্যাকিনটস কোম্পানির অন্যতম অংশীদার হিসেবে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের বোর্ড অব ডাইরেক্টরসের সদস্য।

১৮৩০ সালে দ্বারকানাথ রাজশাহী জেলার কালীগ্রাম পরগণার মালিক এবং চার বছর পরে শাহাজাদপুরেরও জমিদার। এর

পর থেকে শুধুই উপুরে ওঠার পালা।

উনিশ শতকের প্রথমদিকের মানুষ হলেও দ্বারকানাথের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ শতকের আধুনিক মানসিকতার প্রতিফলন সুস্পষ্ট।

খানাপিনা পান ভোজনের সাহায্যে কার্যোদ্ধারের পদ্ধতিটি তার বিলক্ষণ জানা ছিল। আর এইসব খানাপিনার আসরে ইংরেজ রাজপুরুষদের আমন্ত্রণ হত নিয়মিত। কারণ তাদের হাতেই ছিল সাফল্যের সোনার কাঠির ঠিকানা। ১৮৪১ এর ২৫ ফেব্রুয়ারির ভোজসভার বর্ণনা দিতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার আত্মজীবনীতে (পৃঃ ৩৯) লিখেছেন, 'রূপে, গুণে, গানে, সৌন্দর্যে, নৃত্যে, মদ্যে, আলোকে আলোকে, বাগান একেবারে ইন্দ্রপুরী হইয়া গিয়াছিল। এই ইংরাজদের মহাভোজ দেখিয়া কোন কোন বিখ্যাত বাঙ্গালীরা বলিয়াছিলেন যে, 'ইনি কেবল সাহেবদের লইয়া আমোদ করেন, বাঙ্গালীদের ডাকেন না।' এই কথা আমার পিতার কর্ণগোচর হইল। অতএব ইহার পরে তিনি একদিন ঐ বাগানে সমস্ত প্রধান প্রধান বাঙ্গালীদের লইয়া বাইনাচ ও গানবাজনা দিয়া একটা জমকাল মজলিস করিলেন।'

দ্বারকানাথের বিষয় বৈভবের এই শ্রীবৃদ্ধি এই বিকাশের কথা বলতে গিয়ে বেলগাছিয়া বাগানবাড়ির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' লেখকদ্বয় নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তফী [illegible] [illegible] পৃঃ [illegible] [illegible]

'[illegible] হইতে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত, [illegible] [illegible] উনিশ বৎসর কাল, দ্বারকানাথের সম্পদ প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে ছিল। উচ্চপদস্থ দেশীয় ও ইংরেজ উভয় শ্রেণীর লোকই তাঁহাকে সম্মান করিতেন। নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তিনি এই সকল লোককে 'বেলগাছিয়া ভিলায়' প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিতেন।...'

'তৎকালে বেলগাছিয়া ভিলার নিমন্ত্রণ হয় না, বা দ্বারকানাথের সহিত পরিচিত নহেন, এরূপ বলিতে যেন সাহেবরা আপনাদের মর্যাদার হানি মনে করিতেন।' আর এই খানাপিনার আসর ঘিরে মানান জনের নানা মন্তব্যের প্রসঙ্গে সেকালে প্রচলিত একটি ছড়ার উল্লেখ করেছেন সৌদামিনী দেবী,

বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরি-কাঁটার ঝনঝনি,
খানা খাওয়ার কত মজা, আমরা তার কি জানি?
জানেন ঠাকুর কোম্পানি
(প্রবাসী, ১৩১৯/পৃঃ ২০২)

ঠাকুর কোম্পানির প্রাণপুরুষ দ্বারকানাথের ব্যবসায় আর পৈতৃক জমিদারীর সীমা তখন বহুমুখী, বহু বিস্তৃত। কার-ঠাকুর কোম্পানি ছাড়াও শিলাইদহে নীলের কুঠি হয়েছে, কুমারখালিতে রেশম কুঠি, রানীগঞ্জে উইলিয়াম কারপেন্টারের সহযোগিতায় বেঙ্গল কোল কোম্পানি (বার্ষিক ৬ কোটি মনের উপর কয়লা তোলা হত), রামনগরে চিনির কল হয়েছে। রাজশাহী, পাবনার জমিদারীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রঙ্গপুরের (স্বরূপপুরের) জমিদারী হুগলীর মণ্ডলঘাট পরগণার বেশ খানিক অংশ, ভারবাজিনী ও জগদীশপুর যশোরে মহম্মদশাহী, কটকে পরগড়ার জমিদারী, ত্রিপুরার বরকামতার (বরকান্তা?) জমিদারী। এই বিপুল কারবার, বহু বিস্তৃত জমিদারীর অনেকটাই চলত ম্যানেজার, এজেন্ট আর আমলা নির্ভর হয়ে।

কেমন চলত সেকালের জমিদারী কারবার? সেকালের সংবাদপত্রে, সাময়িকীর পৃষ্ঠায় সেই আমলাতন্ত্র নিষ্পেষিত রায়তের কথা প্রকাশিতও


কিশোর দেবেন্দ্রনাথ

হত। তারই এক টুকরো:

"ভূস্বামীর ভবনে বিবাহ, অন্নপ্রাশন, দেবোৎসব বা প্রকারান্তর পুণ্যক্রিয়া এ ব্যাপার উপস্থিত হইলে প্রজাদের অনর্থপাত উপস্থিত। তাহাদিগকেই ইহার সমুদয় বা অধিকাংশ ব্যয় সম্পন্ন করিতে হয়। ইহা মাঙ্গন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তিনি মাঙ্গন অর্থাৎ ভিক্ষা উপলক্ষ করিয়া বলপূর্বক অপহরণ করেন, ভিক্ষুক নাম গ্রহণ করিয়া দস্যুবৃত্তি সাধন করেন। যে বৎসর এরূপ দুই-তিনবার ভিক্ষা না হয়, সে বৎসরই নয়।"

এছাড়া বাড়তি খাজনা আদায় কিংবা আর বৃদ্ধির বিভিন্ন পন্থা প্রকরণের হাল এই লেখার প্রথমে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ঠাকুর পরিবারের দান খয়রাতি মহত্ত্বের অনেকখানির সঙ্গেই জমিদারী, রেশমকুঠি কিংবা নীল চাষীর অনেক দুঃখ, অনেক ঘামের যোগাযোগ ছিল অনিবার্যভাবেই।

এ তো গেল বাইরের কথা। বিষয় বাণিজ্যের কথা। পাশ্চাত্য-ঘেঁষা পার্টি সোসাইটি, পান ভোজনের হররামেশা আয়োজন দ্বারকানাথের অন্তঃপুরের সহজ সরল শান্তির বাতাবরণের অনেকটা এই নষ্ট করে দিয়েছিল। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' উদ্ধৃত করে 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী'র পরিশিষ্টে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন, "...তাহার পর যখন সাহেব [illegible] মেমদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়িল, [illegible] বেলগাছিয়ার বাগানে খানা চলিতে লাগিল, তখন প্রথম প্রথম দ্বারকানাথ খানার টেবিলে বসিতেন না দূরে দূরে থাকিতেন, এবং খানার শেষে [illegible] স্পর্শ ও বস্ত্র ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইতেন। যতদিন এই ভাবে চলিয়াছিল, ততদিন তিনি নিজে দেবপূজা করিতেন। কিন্তু যেদিন হইতে [illegible] দিগের প্ররোচনায় তাহাদের সহিত [illegible] লিপ্ত হইলেন, সেইদিন হইতে নিজে দেবপূজা ত্যাগ করিলেন, এবং নিজের অনুষ্ঠিত [illegible] কাজের জন্য—অর্থাৎ পূজা হোম তর্পণ পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্যের জন্য—ভিন্ন ভিন্ন বেতনভুক ব্রাহ্মণ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শুনা যায়, তাঁহার এইরূপ পুরোহিত সংখ্যা ১৮ জন ছিল

...এই সময় তাঁহার পরিবারস্থ মহিলারা, এমনকি তাঁহার পত্নীও, তাঁহার সহিত একাসনে বসিতেন না হঠাৎ স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতেন

দ্বারকানাথের এই বিলাসী জীবন পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করিয়াছিল। কারণ ব্যবসা এবং সামাজিকতার খাতিরে এইসব প্রমোদসভায় দেবেন্দ্রনাথও সঙ্গী হতেন। আর তারই ফলে...'কিশোর দেবেন্দ্রনাথ এইরূপ প্রলোভনের অনলে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ইহার ফলে সুরা, নাচ ও ধনীপুত্রদিগের কুসঙ্গ কিছুকালের জন্য তাঁহাকে অধিকার করিল ...সে যুগে এই কাঁচা বয়সেই ছেলেদের কাছে কিরূপ সর্বনাশকর প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত হইত ভাবিলে কম্পিত হইতে হয়।"

"বিষয় বাণিজ্যের সুবিধার জন্য দ্বারকানাথ যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার ফলে যখন প্রিয় পুত্রের অনিষ্ট হইতে লাগিল, তখন তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি বার বার ভর্ৎসনা ও অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন বটে কিন্তু পুত্রের অর্থ ব্যয়ের অধিকার সংকুচিত করিয়া দিতে তাহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় সম্মত হইল না। ...কয়েক বৎসর পর (১৮৩৮) দেবেন্দ্রনাথের উপরে সংসারের সমুদয় কর্তৃত্বভার ন্যস্ত করিয়া তাঁহাকে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণে বাহির হইতে হইল। দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে এইরূপে কিছুকাল আপনি আপনার প্রভু হইয়া থাকা আরও অনিষ্টের কারণ হইল।" (দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী/পৃঃ ২৬৭)

এই অনিষ্ট অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম ভাবনার সঙ্গে বিষয় ভাবনার সংঘাত শুরু হয়েছিল। ধর্মের

প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ তাঁকে বিষয়বিরাগী করে তুলেছিল। তত্ত্ববোধিনী সভার কাজে ব্যস্ত থাকতে গিয়ে মাঝে মাঝেই বিষয়কর্তব্যে অবহেলার দায়ে পিতার কাছে তিরস্কৃত হতেন।

"আমরা দেখিতে পাই লাটভগিনীর সম্বর্ধনার ব্যাপারে (১৮৪১) দেবেন্দ্রনাথ বিরক্ত; পিতার ইংলণ্ডবাস হেতু বিষয় দেখিতে হইতেছে বলিয়া (১৮৪৬) দেবেন্দ্রনাথ অসুখী; পিতার ব্যবসায়ের পতনের পর (১৮৪৮) যখন বিষয় বিভব সব বিক্রয় হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে, তখনও দেবেন্দ্রনাথ উদাসীন; বরং বিষয় সম্পত্তির যতটা চলিয়া যায় ততই ভাল, তাঁহার মনের যেন এই প্রকার ভাব।" (দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী/পৃঃ ২৬৯)

দ্বারকানাথও এই বিষয়বিরাগ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ জানতেন। তাঁর কথায়, "তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তিনি বুঝিয়া ছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই সকল বৃহৎ কার্যের ভার আমাদের হাতে পড়িলে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব না। আমাদের হাতে পড়িয়া যদি বাণিজ্য-ব্যবসায় কার্যের পতন হয়, তবে স্বোপার্জ্জিত যে সকল বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী আছে তাহাও তাঁহার সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে এবং পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমিদারীও থাকিবে না।" (দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী/পৃঃ ৮৫)

১৮৪০-এর ২০ আগস্ট একটি 'ডীড অব সেটলমেনট'-এর মাধ্যমে দ্বারকানাথ ৮টি পরগণায় দেখাশোনার ভার ট্রাস্টীদের উপর ছেড়ে দেন। সম্পত্তির সুরক্ষার জন্যে এই ধরনের আইনগত রক্ষা কবচ নেওয়াটা সেকালের রীতি রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৮৪৬-এর ১ আগস্ট ইংল্যানডে হঠাৎই মারা গেলেন দ্বারকানাথ। দেখা গেল ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দেনাও রেখে গিয়েছেন বিরাট অংকের। বিশাল জমিদারীর পরিচালনার দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে এই বিপুল ঋণ পরিশোধের দায়ও দেবেন্দ্রনাথের কাঁধেই এসে পড়েছিল।

১৮৯১-এর একটি বিশেষ দিন।

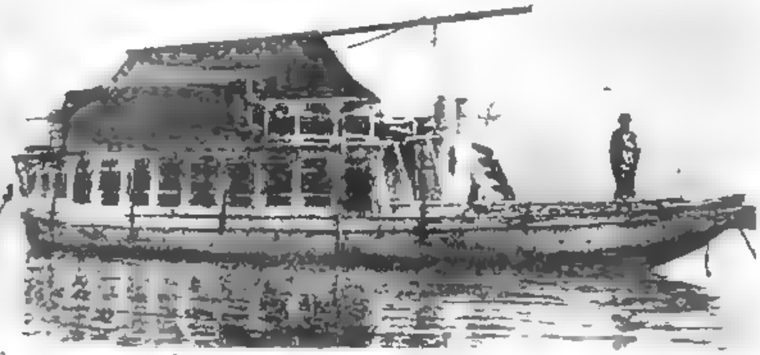
শিলাইদহে ঠাকুরবাবুদের কাছারি কুঠি বাড়ি, সেজেছে উৎসবের সাজে। বাজছে রোশনচৌকি বিরামহীন বাজনা, মঙ্গলশঙ্খ আর উলুধ্বনির আওয়াজের সঙ্গে বাতাসে মিশে যাচ্ছে বরকন্দাজদের বন্দুকের শব্দ!

আজ পুণ্যাহ।

নতুন বাবুমশাই এই পুণ্য দিনে মিলবেন তাঁর প্রজাদের সঙ্গে। তাই এতো আয়োজন। এমন উৎসবের মুখরতা।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ আর পদমর্যাদা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে আসন। নতুন বাবুমশাইয়ের জন্যে 'নজর' নিয়ে প্রজারাও তাঁদের আসনে বসে আছেন। কখন আসবেন তিনি? কখন বসবেন ঐ ভেলভেট মোড়া সুন্দর সিংহাসনটিতে। প্রতীক্ষা তারই—

তিনি এলেন। মঙ্গলশঙ্খ আর উলুধ্বনির মধ্যে চন্দনতিলক পরিয়ে বরণ করা হল তাঁকে। এ পর্যন্ত সবকিছুই ঠিক ঠিক চলছিল। যেমনটি চলে এসেছে দ্বারকানাথের আমল থেকে। কিন্তু হঠাৎই কুঁচকে গেল তাঁর ভুরু, মুখে আঁকা হয়ে গেল পরিষ্কার বিরক্তির রেখা!



বোট 'চিত্রা', শিলাইদহ

সচকিত হয়ে উঠল সকলে। নায়েব-গোমস্তা-আমলারও হতচকিত। বাবুমশাই সিংহাসনে না বসে এগিয়ে গেলেন প্রজাদের মধ্যে! পুণ্যাহের মিলনের উৎসবে ধর্ম আর বর্ণভিত্তিক আসনের ব্যবধান মুছে দিতে আদেশ দিলেন সদর নায়েবকে। কিন্তু এতদিনের প্রথাকে ভেঙে দিতে রাজি হলেন না নায়েবমশাই। 'প্রাচীন প্রথা আমি বুঝি না, সবার একাসন করাতে হবে। এই আমার প্রথম হুকুম'—হুকুম দিলেন নতুন বাবুমশাই। জমিদার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের এই হল প্রথম হুকুম। আর এই হুকুমের জন্যেই সেদিনের পুণ্যাহ প্রজার সঙ্গে জমিদারের মিলনের উৎসব হয়ে উঠেছিল।

জমিদার হিসেবে অভিষেক হলেও রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভূ হিসেবে। তার আগে এসেছেন বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ, এসেছেন সেজদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, এসেছেন ভগ্নিপতি সারদাপ্রসাদ। দেবেন্দ্রনাথ নিজেও এসেছেন; কিন্তু জমিদারী দেখাশোনার চেয়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজেই তাঁর বেশি সময় ব্যয় হয়ে যেত

এই সময়ে মনীষী হরিনাথ মজুমদারের 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় ঠাকুর জমিদারীর প্রজাদের উপর নায়েব, আমলাদের অত্যাচার, অবিচারের কথা প্রকাশিত হত। তারই পরিপ্রেক্ষিতে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারীর দায়িত্বভার রবীন্দ্রনাথের হাতে ছেড়ে দিতে মনস্থ করে এক চিঠিতে লিখলেন:

"এইক্ষণে তুমি জমিদারির কার্য্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও; প্রথমে সদর কাছারিতে নিয়মিত রূপে বসিয়া সদর আমিনের নিকট হইতে জমা ওয়াশিল বাকী ও জমা খরচ দেখিতে থাক এবং প্রতিদিনের আমদানি রপ্তানি পত্র সকল দেখিয়া তার সারমর্ম নোট করিয়া রাখ। প্রতি সপ্তাহে আমাকে তাহার রিপোর্ট দিলে উপযুক্ত মতে তোমাকে আমি উপদেশ দিব এবং তোমার কার্য্যে তৎপরতা ও বিচক্ষণতা আমার প্রতীতি হইলে আমি তোমাকে মফস্বলে থাকিয়া কার্য্য করিবার ভার অর্পণ করিব।" (জমিদার রবীন্দ্রনাথ/অমিতাভ চৌধুরী, পৃঃ ১৪)

কবি রবীন্দ্রনাথের জমিদারী ভূমিকায় দেবেন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৯৬-র ৮ আগস্টের পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে জমিদারী পরিচালনার ভার রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তিনি। মাসোহারা দু'শ টাকা।

কবি রবীন্দ্রনাথ তার স্বভাবজ আসমানদারির সঙ্গে জমিদারী পেশাকে সংপৃক্ত করে একটু ভিন্নতর পথে পা বাড়িয়েছিলেন প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধ পথচারণার ইঙ্গিত মিলেছিল তার পুণ্যাহ অভিষেকের প্রথম দিনটিতেই। সংঘাতের সেই শুরু।

শোনা যায়, এ নিয়ে অভিযোগপত্রও গিয়েছিল মহর্ষির দরবারে। এমন হলে জমিদারী চলবে না। কিন্তু এই অভিযোগে যে মহর্ষির 'প্রতীতি'তে চিড় ধরেনি সে প্রমাণ মিলেছিল ক'বছর পরের আমমোক্তারনামাতে।

আয়তনে বিশাল এই একমালি জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ মাত্র কয়েক বছর পালন করেন। এরপর হেমেন্দ্রনাথের সাবালক ওয়ারিশদের হাতে যায় ওড়িশার জমিদারী। গগনেন্দ্র অবনীন্দ্রনাথদের দখলে যায় পরগণা শাহজাদপুর। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ যৌথভাবে পরগণা বিরাহিমপুর ও কালীগ্রাম পরগণার মালিক হন। পরে আর এক দফা ভাগ-বাঁটোয়ারা হওয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথের অংশে পড়ে রাজশাহী জেলার কালীগ্রাম পরগণা, বিরাহিমপুরসহ শিলাইদহ চলে যায় সত্যেন্দ্রনাথের ছেলে সুরেন্দ্রনাথের ভাগে। কিন্তু সে জমিদারীরও হাত বদল হয়—দেনার দায়ে বাঁধা পড়ে শিলাইদহ ভাগ্যকুলের জমিদারদের হাতে।

এইসব ভাগাভাগির পর্ব ইতিহাসের পাতায় রেখে ফিরে আসা যাক পুরনো কথায়—কবি রবীন্দ্রনাথের জমিদার রবীন্দ্রনাথে সার্থক উত্তরণের কথায়, ঠাকুরবাবুদের চিরা-

চলিত জমিদারী অধ্যায় যেখানে বাঁক নিয়েছে। সেখান থেকে আরও আরও অনেক গভীরে—১৮৯০ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কাল এক নিরলসকর্মা জমিদারের জমিদারীর কথায়। তার আগে তাঁরই চোখ দিয়ে দেখা যাক ঠাকুর জমিদারীর রায়তদের জীবন :

"আহা, এমন প্রজা আমি দেখিনি—এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে। আমার কাছে এই সমস্ত দুঃখ পীড়িত অটল-বিশ্বাসপরায়ণ অনুরক্ত ভক্ত প্রজাদের মুখে এমন একটি কোমল মাধুর্য আছে, এদের দিকে চেয়ে এবং এদের কথা শুনে সত্যি সত্যি বাৎসল্যে আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়।…"(জমিদার রবীন্দ্রনাথ/পৃঃ ৩০)

অকৃত্রিম বাৎসল্য ধন্দিত হৃদয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারীর 'বঙ্গভূখণ্ডে' এক বিরাট কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন কারণ তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, 'বিদেশী চলিয়া গেলেই এ দেশ স্বদেশ হইবে না।' তাই গ্রামকেন্দ্রিক ভারতবর্ষে গ্রামোন্নয়নের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা আঁকতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এ সবই তাঁকে প্রচলিত স্রোতের বিরুদ্ধাচারী হয়ে করতে হয়েছে। শ্রেণী স্বার্থের তাঁবেদার জমিদারগোষ্ঠী এবং 'পনেরো টাকা মাস মাইনেতে' যারা বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব করে সেই নায়েব-আমিন আমলা-গোমস্তাদের স্বার্থের মৌচাকে ঢিল ছুঁড়তে হয়েছে। এদের দংশন—তাও সহ্য করতে হয়েছে। জমিদার রবীন্দ্রনাথের প্রথম ঘোষণাই ছিল, 'সাহাদের হাত থেকে শেখদের বাঁচাতে হবে। এটাই আমার সর্বপ্রধান কাজ।'

মহাজনী কারবারের কারবারি 'সাহা'দের হাত থেকে, দরিদ্র মুসলমান প্রজাদের রক্ষা করতেই ১৯০৫ সালে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করেন শিলাইদহ ও কালীগ্রামে। ১৯১৩-তে 'নোবেল পুরস্কারের' এক লক্ষ আট হাজার টাকাও এই ব্যাঙ্কেই গচ্ছিত রেখেছিলেন। এই গচ্ছিত টাকা কৃষিব্যাঙ্কের ব্যবসা বন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনাও বন্ধ হয়ে যায়।

প্রজাদের আত্মার আত্মীয় রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, 'আমি যদি আমার প্রজাদের একমাত্র জমিদার হতুম তাহলে আমি এদের বড় সুখে রাখতুম এবং এদের ভালোবাসায় আমিও সুখে থাকতুম।'

এই সুখে রাখার জন্যে তাঁর নিরন্তর প্রয়াসের কথা রাজশাহীর জেলা গেজেটিয়ারে ১৯১৬ সালে লিখেছেন আই সি এস ও-ম্যালী :

'It must not be imagined that a powerful landlord is always oppressive and uncharitable. A striking instance to the contrary is given in the Settlement Officer's account of the estate of Rabindranath Tagore, the Bengali poet, whose fame is worldwide. It is clear that to poetical genius he adds practical and beneficial ideas of estate management, which should be an example to the local Zemindars.

A very favourable example of estate government is shown in the property of the poet, Sir Rabindranath Tagore. The proprietors brook no rivals. Sub-infeudation within the estate is forbidden, raiyats are not allowed to sublet on pain of ejectment. There are three divisions of the estate, each under a sub-manager with a staff of tahasil-



dars, whose accounts are strictly supervised. Half of the Dakhilas are checked by an officer of the head office. Employees are expected to deal fairly with the raiyats and unpopularity earns dismissal .....Remissions of rent are granted when inability to pay is proved. In 1312 it is said that the amount remitted was Rs. 57,595.

There are Lower Primary Schools in each division and at Patisar, the centre of management, there is a High English School with 250 students and a Charitable dispensary. These are maintained out of a fund to which the estate contributes annually Rs. 1250 and the raiyats 6 pies to rupee in their rent. There is an annual grant of Rs. 240 for the relief of cripples and the blind. An agricultural bank advances loans to raiyats at 12 percent per annum...the bank has about Rs. 90,000 invested in loans.

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মতই জমিদারী পরীক্ষানিরীক্ষার ধারাও বয়েছে বিচিত্রপথে। কখনও সমবায়ী চেতনা জাগাতে চেয়েছেন প্রজাদের মধ্যে, কখনও নেমেছেন পাটের কারবারে কিংবা তাঁতের ব্যবসায় বসিয়েছেন তাঁত, প্রবৃত্ত হয়েছেন টেকসটাইল ইনসটিটিউট গড়ে তোলায়। চাষের ক্ষেত্রে নিত্য-নতুন পরীক্ষা চালিয়েছেন—সেই পরীক্ষার পরিধিও বহু বিস্তৃত ; পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কৃষিবিদ্যায় উন্নততর শিক্ষায় শিক্ষিত করে এনেছেন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবার সেইসঙ্গে নিজেও মেতেছেন নৈনিতাল আলুর চাষে, রেশমগুটির চাষে।

শিলাইদহের ৮০ বিঘা জমি খাস করে নিয়ে বসেছিল রথীন্দ্রনাথের কৃষিখামার—আমেরিকার আলু-ভুট্টা-টমেটোর চাষ। সেই ১৯১০ সালেই এসেছিল ট্র্যাকটর আর সেচের জন্যে বসেছিল পাম্পসেট। ভাবতে অবাক লাগলেও বিংশ শতকের প্রথম দশকেই আধুনিকতম কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল এই বাংলাদেশেরই এক প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ কৃষক। আর এই পরিচিতির মূল হোতা অবশ্যই সেই আসমানদার, যিনি পেশায় জমিদার!

জমিদারী সেরেস্তার পরিচালনায় গতানুগতিক ব্যবস্থারও অনেক রদবদল করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জমাওয়াশিল কাগজের বদলে কার্ড ইনডেকস প্রথা চালু করেন। জমিদারী ব্যবস্থার আদায় তহশীল, জরিপ, জমাবন্দী, মামলা মোকদ্দমা, জমিজমা বন্দোবস্ত, হিসেব-পত্র সবকিছুই সুনির্দিষ্টভাবে নথিবদ্ধ থাকতো। নতুন কোন বিধির প্রবর্তন বা সংশোধন সংযোজিত হলে তাও সঙ্গে সঙ্গেই স্লিপের আকারে তা আঁটা হয়ে যেত মরক্কো চামড়ায় বাঁধাই বিশাল খাতায়।

বার্ষিক বাজেট, আয়-ব্যয়ের হিসেব, কাছারির কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি, নতুন নিয়োগ, বার্ষিক পার্বণী সব কিছুই জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই সেরে ফেলা হত তারপরই হত পুণ্যাহের উৎসব আষাঢ়ের কোন এক শুভদিনে।

মামলা দায়ের করা, কর্মচারি নিয়োগের ক্ষেত্রে জমিদারের মঞ্জুরী নিতে হত, আমলাদের কাজের বিরুদ্ধে বিচারের প্রার্থনা জানাবার জন্যে প্রজাদের কাছে আপীলের দরজা সব সময়ই খোলা ছিল। এইসব আধুনিকীকরণ করতে গিয়ে বহু আমলার বিরাগের কারণ হয়েছিলেন তিনি, বিক্ষোভ জমেছিল এক-শ্রেণীর প্রজাদের মধ্যেও। নতুন নিয়মনীতিকে



কুঠিবাড়ি : শিলাইদহ

সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতেন অনেকেই - বিক্ষোভ হয়েছিল চুয়াপাড়ায়, প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছিল শিলাইদহ চরেও..

আমলাদের অসহিষ্ণুতা, প্রজাদের অবুঝ ক্ষোভ এসর্বকিছুই ওঁর গ্রামোন্নয়নের মহতী কর্মযজ্ঞের কাজকে বেশ কয়েক কদম পিছিয়ে দেবে এমন আশংকা দেখা দেওয়ায় জমিদারী কাজে নতুন রক্ত সঞ্চারের জন্যেই তিনি জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, জানকী রায়, চন্দ্রময় সান্যাল প্রমুখ শিক্ষিত যুবকদের আমলার কাজে নিয়োগ করেন। গ্রাম সংস্কারের দায়িত্ব দিয়ে নিয়ে আসেন অতুল সেন, কালীমোহন ঘোষের মত উদ্যমী যুবকদের।

রথীন্দ্রনাথ তাঁর "পিতৃস্মৃতি"তে এই জমিদারীর কথা লিখেছেন, 'বাবা জমিদারির কাজ দেখতে ভালোই বাসতেন। কুঠি বাড়িতে যতদিন থাকতেন প্রতিদিনই সকাল বেলায় আমলারা খাতাপত্র সঙ্গে তাঁর কাছে আসত। বাবা যে জমা-ওয়াশিল-বাকি প্রভৃতি জমিদারির জটিল হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝতেন তা পরে যখন আমাকে জমিদারি দেখার ভার দিলেন তখন আমি জানতে পেরেছিলাম। তিনি নিজেই আমাকে জমিদারি সেরেস্তার হিসাব রাখার সমস্ত প্রণালী শিখিয়ে ছিলেন। তিনি আমলাদের কথায় চোখবুজে কখনো কোন চিঠি বা কাগজ সই করতেন না। বাবাকে সেজন্য কর্মচারীরা খুবই সমীহ করত। সকাল বেলায় হিসাব দেখা হলে আর চিঠিপত্র সই করা হয়ে গেলে প্রজাদের দরবার বসত। বাবার কাছে প্রজাদের অবারিত দ্বার ছিল, কোন কর্মচারী সেই অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত কর'তে সাহস করত না। প্রজারা বাবার কাছে সবসময় যে নালিশ করতে আসত তা নয়—তাঁর কাছে ঘরের কথা বলতে তাদের সুখদুঃখের কথা জানাতেও আসত।...(পিতৃস্মৃতি/পৃঃ ৪১)

এই সুখ দুঃখের শরিক হতে গিয়েও বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ঝুলি ভরাতে হয়েছে ওঁকে সুখের সঙ্গে দুঃখের সঞ্চয়ও বড় অল্প নয়--

'আমার জমিদারিতে নদী বহুদূরে ছিল, জলকষ্টের অন্ত ছিল না। আমি প্রজাদের বললুম, 'তোরা কুয়ো খুঁড়ে দে, আমি বাঁধিয়ে দেব।' তারা বললে, 'এ যে মাছের তেলে মাছ ভাজবার ব্যবস্থা হচ্ছে।' আমরা কুয়ো খুঁড়ে দিলে আপনি স্বর্গে গিয়ে জলদানের পুণ্যফল আদায় করবেন আমাদের পরিশ্রমে!' আমি বললুম, 'তবে আমি কিছুই দেব না।' এদের মনের ভাব এই যে, 'স্বর্গে এর জমাখরচের হিসাব রাখা হচ্ছে—ইনি পাবেন অনন্তপুণ্য, ব্রহ্মলোক বা বিষ্ণুলোক চলে যাবেন, আর আমরা সামান্য জল মাত্র পাব।'

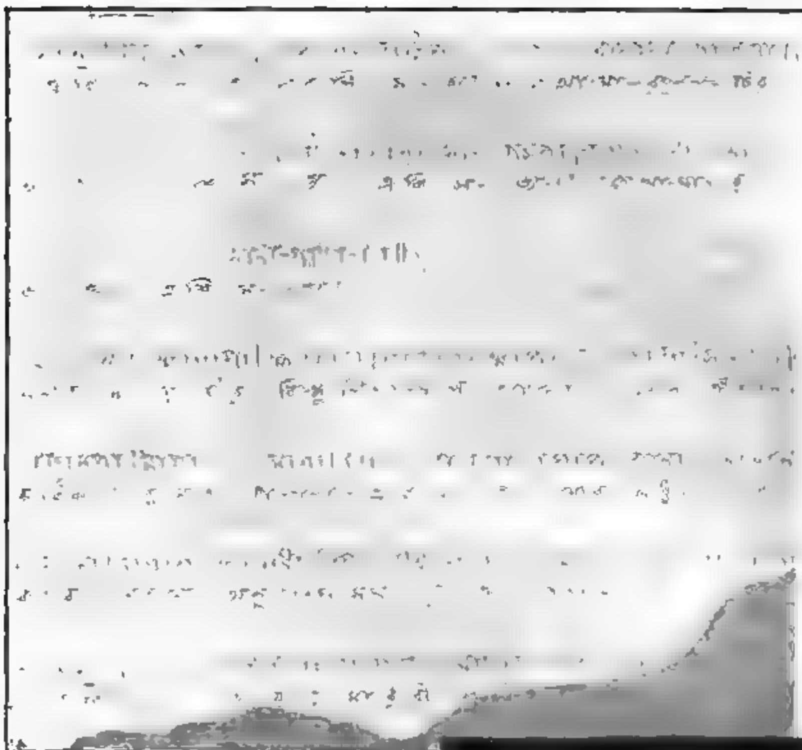
এই অজ্ঞতা, এই অন্ধ মানসিকতার সংস্কারের প্রচেষ্টাতেই ১৯০৮ সালে তিনি মণ্ডলীপ্রথার প্রচলন করেন। এই মণ্ডলীপ্রথা প্রবর্তন সম্পর্কে পল্লীপ্রকৃতিতে লিখেছেন, 'আমাদের জমিদারির মধ্যে একটা কাজ পত্তন করে এসেছি। বিরাহিমপুর পরগণাকে পাঁচটা মণ্ডলে ভাগ করে প্রত্যেক মণ্ডলে একজন অধ্যক্ষ বসিয়ে এসেছি।...'

বিরাহিমপুরের এই পাঁচটি মণ্ডলের অধ্যক্ষের তালিকায় ছিলেন : ১) শিলাইদহ—নায়েব বিপিনবিহারী বিশ্বাস, ২) জানিপুর বনগ্রাম—নায়েব নলিনী চক্রবর্তী ৩) কুমারখালি পাঁঠি—নায়েব ভূপেনচন্দ্র রায় ৪) কয়া-কালোয়া—নায়েব রতিকান্ত দাস ৫) সদিরাজপুর-রাধাকান্তপুর—নায়েব সতীশ চন্দ্র ঘোষ। প্রতি মণ্ডলীতে নায়েব বাদে চারজন প্রজা প্রতিনিধিও ছিল। একই ব্যবস্থা চালু হয়েছিল কালীগ্রামেও। তিনটি মণ্ডলীতে ভাগ হয়েছিল কালীগ্রাম পরগণা।

এই মণ্ডলী প্রথার প্রবর্তনের ফলে এই দুই পরগণারই বহিরঙ্গের অনেকখানিই রূপ বদল হয়েছিল। রাস্তাঘাট সংস্কার হয়েছিল, সংস্কৃত হয়েছিল মন্দির, দরগা, হাট, বিদ্যালয়-মাদ্রাসা-মক্তব। কিন্তু ভিতরে ভিতরে দুরারোগ্য ক্ষয়রোগের মত কাছারিগুলিতে মাটির নীচের রাজনীতি, পারস্পরিক খেয়োখেয়ি আর অসন্তোষ দানা বাঁধছিল। আমলা-জোতদারদের সেই অসন্তোষের আগুনকে নেভাতে গিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ; শেষবারের মত যখন জমিদারী থেকে বিদায় নিয়ে আসেন তখন অনেক আশা অনেক আকাঙ্ক্ষার যোগফল মণ্ডলীপ্রথার ভিত টলটলায়মান।

জীবনের শেষ সিঁড়ির ধাপগুলিকে অতিক্রম করে পায়ে পায়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগে অনেক বেদনা নিয়ে তাকে বলতে হয়, 'ইউরোপের মত আমাদের জনসমূহ নাগরিক নয়—চিরদিনই চীনের মতো ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান। নাগরিক চিত্তবৃত্তি নিয়ে ইংরেজ আমাদের সেই ঘনিষ্ঠ পল্লী জীবনের গ্রন্থি কেটে দিয়েছে। তাই আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে ঐ নীচের দিক দিয়ে। সেখানে কী অভাব, কী দুঃখ, কী অন্ধতা, কী শোচনীয় নিঃসহায়তা- তা বলে শেষ করা যায় না। এইখানেই পুনর্বার প্রাণসঞ্চার করবার সামান্য আয়োজন করেছি—না পেয়েছি দেশের লোকের কাছ থেকে উৎসাহ, না পেয়েছি কর্তৃপক্ষের সহায়তা। তবু আঁকড়ে ধরে আছি। দেশকে কোন দিক থেকে রক্ষা করতে হবে আমার তরফ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর আমার—ঐ গ্রামের কাজ।' এই কাজ, এই কর্মযজ্ঞই জমিদার রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই রথীন্দ্রনাথ এই জমিদারী দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন — সেও খুব অল্পদিনের জন্য। এরপরেই এলো দেশ বিভাগের পালা। শিলাইদহের ইতি বদল হয়েছিল আগেই, কালীগ্রামও চলে গেল পূর্ব পাকিস্তানে। ঠাকুর পরিবারের ছয় পুরুষের জমিদারীও ইতিহাস হয়ে গেল। সেই ইতিহাসের মূক সাক্ষী কুঠিবাড়ি আজ সংরক্ষিত স্মৃতি! পদ্মাও সরে গিয়েছে অনেকটা দূরে। ★



রবীন্দ্রনাথের স্বরলিপি

রবীন্দ্রনাথের গান কতখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত ?

সুভাষ চৌধুরী

প্রশ্নটা দুটো ফলার মত আমাদের সামনে উদ্যত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশি বছরের জীবনে যে দু' হাজারেরও বেশি গান লিখেছিলেন তার সবই কি রবীন্দ্রসংগীত ? এর পাশাপাশি প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে, স্বরলিপি নিয়ে, গায়নরীতি নিয়ে এবং সর্বোপরি কিছু মানুষের ব্যবসাদারির ফলে যা দাঁড়িয়েছে তাতে রবীন্দ্রসংগীতকে কি আর রবীন্দ্রসংগীত বলা যায় ?

রবীন্দ্রসংগীত বলতে আজ যে পূর্ণতার আভাস জাগে তার মূলে আছে কথা ও সুরের সুষম অনুপাত ভাবের প্রাতিস্বিকতা ও সংযত বিন্যাসের এক শিল্পিত অভিব্যক্তি। এ জিনিস তো একদিনে হয়নি। সুদীর্ঘদিনের সাধনায়, নিরীক্ষায়, গ্রহণবর্জনে রবীন্দ্রনাথ ধরেছিলেন তাঁর সঠিক আত্মপ্রকাশের নান্দনিক মাধ্যমটিকে। তার আগে ও পরেও অনেক কাঁচা হাতের কাজ, অনেক ভীরুতা, নিছক অনুকরণ, প্রথাবদ্ধতা ও দ্বিধাকম্পিত সৃজন-বেদনা তাঁর অনেক গানে রয়ে গেছে। সেগুলি রবীন্দ্রসংগীত বলে আসরে ও রেকর্ডে গাওয়া কি ঠিক হচ্ছে ? রবীন্দ্রনাথের সব গানই রসের বিচারে ও পরিণতির মানদণ্ডে পুরো নম্বর পাবে না। তবু নির্বিচারে সবই যে চালানো হচ্ছে তার অনেকটাই নিজেকে জাহির করা, নিছক স্টান্ট কিংবা ব্যবসায়িক চাল নয় তো ?

এই কথাগুলো সামনে রেখে এবার সরাসরি সমস্যাটার মধ্যে প্রবেশ করা যাক।

'রবীন্দ্রনাথের গান' আর 'রবীন্দ্রসংগীত'-এর মধ্যে অনেক দূরত্ব। 'রবীন্দ্রনাথের গান' 'রবীন্দ্রসংগীত' হয়ে উঠেছে অনেক পথ-পরিক্রমার পর। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভার স্পর্শ পেয়ে 'রবিবাবুর গান' ক্রমে 'রবিঠাকুরের গান'-এর সেতু পেরিয়ে 'রবীন্দ্রসংগীত'। বিষয়টি অনুধাবন করতে হলে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সংগীত সৃষ্টির কালক্রমিক ইতিহাস যেমন জানা প্রয়োজন তেমন অবশ্যই পরিচয় থাকা চাই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সঙ্গে। এসব কথা বারবার আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন সভাসমিতিতে—যথারীতি সেই দিনটির পর আর এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর কোনো উদ্যোগের কথা জানা যায়নি।



রবীন্দ্রনাথ গাইছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা পেন্সিল স্কেচ

'রবীন্দ্রসংগীত' বললেই এমন একটি গানের ধরন আমাদের মনে মুদ্রিত হয়ে যায় যা কেবল রবীন্দ্রনাথের রচনা বলেই নয়, শুধু রবীন্দ্রনাথের সুরযোজনার জন্যও নয়, সবকিছু মিলিয়ে এমন একটি রূপকল্পের সৃষ্টি হয়, এমন রসের আভাস মেলে, যা দিয়ে অনায়াসে বোঝা যায়, জানা যায়, চেনা যায়। এমন একটি স্বতন্ত্র বৈলক্ষণ্যের প্রকাশ যা উপলব্ধি করার জিনিস—যা গীতকার সুরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব। অনেকসময় দূর থেকে ভেসে আসা সুরেই গানের আভা বিভাসিত হয়ে ওঠে। সুর গঠনের বিশিষ্টতার প্রামাণিকতা এখানেই। আর যখন গানের শব্দসহ শুনি তখন তার দীপ্তি বুঝিয়ে দেয় এ গান কার সৃষ্টি তবে মেনে নেওয়া ভালো এই গান যথার্থ উপভোগ করার জন্য শ্রোতারও কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন।

আশি বছরের জীবনে ষাট বছরেরও কিছু বেশি সময় ধরে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন। এ যাবৎ সংগৃহীত গানের সংখ্যা:

গীতবিতান প্রথম খণ্ডের পূজা পর্যায়ে ৬১৭ এবং স্বদেশ ৪৬। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রেম ৩৯৫, প্রকৃতি ২৮৩, বিচিত্র ১৪০, আনুষ্ঠানিক ২১ এবং তৃতীয় খণ্ডের (বৈশাখ ১৩৮৬ সংস্করণ) ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ২০, নাট্যগীতি ১৩২, জাতীয় সংগীত ১৬, পূজা ও প্রার্থনা ৮৩, আনুষ্ঠানিক সংগীত ১৭, প্রেম ও প্রকৃতি ১০৯, পরিশিষ্টে ১৪টি গান ছাড়া নাট্যগীতি 'পরিশোধ', গীতিনাট্য 'কালমৃগয়া', 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'মায়ার খেলা' এবং নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা' ও 'মায়ার খেলা'। এই বিশাল সংগীতের ভাণ্ডার আমাদের বিস্মিত করে, চমকিত করে, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত ভাব রসের সন্ধানে আমরা ডুব দিতে পেরেছি কতটুকু ? এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে আমাদের ভাবতেই হয় তাঁর সৃষ্টির গভীরতার প্রসঙ্গে। প্রসঙ্গত এসেই পড়ে—জীবনের কোন সময় থেকে তাঁর গান নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে শুরু করেছে এই প্রশ্ন। নির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া সম্ভব বা সংগত নয়। তবে একথা অনায়াসেই বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন প্রায় তিরিশের কোঠার শেষাশেষি, তখন থেকেই তাঁর গানে ভাব ও সুরের একটি ক্রমবিকাশের সুস্পষ্ট ধারা প্রবাহিত হতে দেখা যায়। এর আগের রচিত গানগুলির মধ্যেও বিচ্ছিন্নভাবে এমন অনেক গান আছে যা কালজয়ী কিন্তু সেখানে ক্রমবিকাশের নির্দিষ্ট ধারার অভাব পরিলক্ষিত


বাল্মীকি প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথ

হয়, বিচ্ছিন্নভাবে এক একটি গান সেখানে স্বমহিম।

এমনি একটি গান—বাইশ বছর বয়সের রচনা ও সুরযোজনায় 'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে'। গানটির গঠন সাধারণ চারতুকের গানের মতো নয়। 'কে' শিরোনামে ভারতী পত্রিকায় যখন প্রকাশিত হয় তখন ছত্র সংখ্যা ছিল উনত্রিশ। 'গানের সুরে খাম্বাজ, পরজ, কালাংড়া রাগিণীর মিশ্রণ--- এ গানের সুর ভাবের সঙ্গে মিল রেখে নানা রূপে আপনাকে বিস্তার করতে করতে কবিতার পঙ্‌ক্তির সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।' রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সংগীত সৃষ্টির মধ্যে এই গানটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বয়সেই তাঁর এই গানটি 'রবীন্দ্রসংগীত' সংজ্ঞার আবশ্যকীয় শর্ত পালন করেছে। এই ধরনের আরো কিছু গানের দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব কিন্তু অজস্র গান আছে যা রবীন্দ্রনাথের হয়েও 'রবীন্দ্রসংগীত' হয়ে ওঠেনি। কয়েকটি গানের বাণীতেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যেমন :

গা সখী, গাইলি যদি, আবার সে গান।
কতদিন শুনি নাই ও পুরানো তান ॥

অথবা

ও কী কথা বল সখী, ছি ছি,
ওকথা মনে এনো না।

অথবা

ঢাক সখা, মুছ আঁখি।
আমার তরেও কাঁদিবে কি!
কে আমি বা! আমি অভাগিনী—
আমি যদি তাহে দুখ কিবা ॥

এই তালিকা দীর্ঘ করা যায়। এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে কোনো কোনো নাটকের গান এবং আনুষ্ঠানিক কিছু গান। নাটকের গানের উল্লেখ করতেই হল' কারণ আজকাল বহু শিল্পী রবীন্দ্রনাথের অপ্রচলিত গান গেয়ে চমকে দেবার তাগিদে বিনা অনুষঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে যখন পরিবেশন করেন তখন যে কোনো শিক্ষিত শ্রোতার মানসিক অবস্থা কী হয় তা সহজেই অনুমেয়। এমনি অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় যেগুলি রবীন্দ্রনাথের গান হয়েও রবীন্দ্রসংগীত হয়ে ওঠেনি। এগুলির অধিকাংশই রচিত হয়েছে তাঁর গান রচনার প্রথম যুগে। এছাড়া আছে বেশ কিছু ভাঙা গান। যেখানে কোনক্রমেই রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ বিকশিত নন। তেমনি তিনটি গান :

হে মন, তাঁরে দেখো আঁখি খুলিয়ে
যিনি আছেন সদা অন্তরে ॥

অথবা

আজি মোর দ্বারে কাহার মুখ হেরেছি।
জাগি উঠে প্রাণে গান কত যে।
গাহিবার সুর ভুলে গেছি রে ॥

অথবা

ঘোর দুঃখে জাগিনু, ঘনঘোরা যামিনী
একেলা হায় রে—তোমার আশা হারায়ে ॥

এই ধরনের গানের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে হতে 'তুহুঁ হৃদি প্রাণবিমোহন' এমন কি 'জাগে নাথ জোছনা রাতে'র মতো গানেও হয়তো বা পৌঁছে যাওয়া যায়। সর্বক্ষেত্রেই একই বক্তব্য অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে এই ধরনের কোন গানই 'রবীন্দ্রসংগীত' হয়ে ওঠেনি। তবু একথা মানতেই হবে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত গান সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে বলেই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতকার-সুরকারের সৃষ্টির ক্রমবিকাশের মহিমা উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছি। কালক্রমিক রচনার ইতিহাস না জানা থাকলে কখনোই পূর্ণ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে 'বলি ও আমার গোলাপ বালা' থেকে 'প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে'র উত্তরণের ইতিহাস তাই আজ ততটা অস্পষ্ট নয়।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো কোনো রবীন্দ্রসংগীত-প্রেমী বিরক্তিভরে প্রশ্ন করবেন—'তবে রবীন্দ্রনাথের গান শতকরা কতখানি রবীন্দ্রসংগীত?' তখন তার যা উত্তর হবে সে বড়ো সুখপ্রদ নয়। রবীন্দ্রসংগীত জানতে হলে বুঝতে হলে শুধুই কি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান কণ্ঠস্থ করলেই সমগ্র বিষয়টির ওপর অধিকার জন্মায়? এক্ষেত্রে কিছুতেই তা সম্ভব নয়। অথচ দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বর্তমান অবস্থায় তাই।

আপাতদৃষ্টিতে সহজসাধ্য বলে রবীন্দ্রনাথের গান শেখার আগ্রহ বেড়েছে। উপরন্তু যদি দামী নামী শিক্ষায়তন হয় তাহলে তা স্ট্যাটাস সিমবলের কাজ করে। সারা বাংলাদেশে অজস্র সংগীত-শিক্ষায়তনে শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের একটি বিশেষ স্থান। প্রতি বছর শত শত ছাত্রছাত্রী ডিগ্রি ডিপলোমা পাচ্ছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেখানে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান কণ্ঠস্থ করিয়ে দেওয়াতেই শিক্ষার সমাপ্তি। তাই তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের গান অন্য আর পাঁচরকম গানের মতো। তাই যে কোন আসরে গেলেই শুনতে পাবেন শিল্পীদের রেকর্ডে প্রচারিত জনাদৃত গান। বারবার একই গান উদ্দেশ্যহীনভাবে গেয়ে চলেছেন আর শত শত শ্রোতা শুনছেন। সে কিসের টানে? সে কি রবীন্দ্রনাথের গানের টানে? দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ শ্রোতাই আসেন তাদের প্রিয় শিল্পীর গান শুনতে। একে কি বলব রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার প্রসার বেড়েছে? এ তো গেল শহরের অবস্থা। গ্রামাঞ্চলের যে কী অবস্থা তা যাদের অভিজ্ঞতা আছে তারাই জানেন, অন্যের পক্ষে তা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে।

আরো একটি বিষয় এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে। 'রবীন্দ্রনাথের গান' আজ অনেকের কাছে কেবল পণ্যের সামগ্রী বিশেষ। অবশ্যই বাজারে সাজিয়ে গুছিয়ে বিক্রয়ের যোগ্য করে তুলেছেন তারাই—এই তাদের বিশ্বাস। এই 'সাজিয়ে গুছিয়ে' শব্দতেই আপত্তি। এর তো কোনো সীমারেখা টানা যাবে না। যার যেমন খুশি রঙ চড়াবেন আর তাতে 'রবীন্দ্রনাথের গান' সৌভাগ্যের অভাবে 'রবীন্দ্রসংগীত' হয়ে উঠবে না। বিষয়টির প্রতি তাদের মমত্ব থাকলে এমনটি হতে দিতেন না। রবীন্দ্রসংগীতকে তার যথাযথ মর্যাদা দিতে যত না তাদের আগ্রহ তার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহ শ্রোতার রুচি অনুসারে রবীন্দ্রনাথের গানকে সাজিয়ে তোলা।

একদল গায়ক রেকর্ডের জনাদৃত গান



রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ

গাইছেন। আর একদল তাঁদের পাণ্ডিত্য জাহির করার তাগিদে রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ, ধামার গাইছেন, কেউ অ-সাধারণ হবার জন্য 'আড়াঠেকা' 'মধ্যমান' তালের গান গাইছেন। আর একদলের ক্যাপিটাল 'অপ্রচলিত রবীন্দ্র-সংগীত'। অন্য আর একদল গাইছেন তথাকথিত আধুনিক ছাঁচে ঢেলে। সকলেই গাইছেন রবীন্দ্রনাথের গান। এ'দের ধারণা এ'রাই রবীন্দ্রনাথের গানকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব আর কতটুকু। এমন তো কতজনই যারা বাংলায় গান লিখেছেন সুরও যোজনা করেছেন তাদের গানের প্রতি এত আগ্রহ নেই কেন?

সবই ঠিক, কিন্তু এদের ক'জনের গান রবীন্দ্রসংগীতকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়? রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি মমত্বহীনতার কথা আগেই বলেছি। পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয়—আজও কলকাতা বেতার কেন্দ্রে 'রবীন্দ্রসংগীত' লাইট মিউজিক-এর পর্যায়ে রয়ে গিয়েছে। এখানে সব শিল্পীই নীরব; কারণ এখানে তাঁদের 'টিকি বাঁধা'। আর এই মাধ্যমগুলির প্রচারের মহিমায় এক ডজন রবীন্দ্রনাথের গান কণ্ঠস্থ করতে পারলেই তিনি শিল্পী। তাঁদের মূলধন নিছক সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। অথচ সবাই জানেন ও বোঝেন যে এরা রবীন্দ্রনাথের গান গাইছেন স্বল্প পুঁজি নিয়েও বাজারে বিখ্যাত হওয়া যায় বলে, অন্য কোনো কারণে নয়। অধিকার ভেদ এ'রা মানেন না। যে কেউ যে কোনো ধরনের গান (তা তাঁর কণ্ঠের উপযোগী অথবা গাওয়ার যোগ্যতা তার আছে কিনা না ভেবে) পরিবেশন করেন। আর দামী এবং নামী হলে যে কোনো রকম যথেচ্ছাচারের অধিকারী হন এরা। কারণ তাঁর বাজার আছে। আমাদের দেশের রাগ-সংগীতের শিল্পীদের ক্ষেত্রে কিন্তু এমনটি ঘটার উপায় নেই। সেক্ষেত্রে যিনি যত নামী ও দামী শিল্পী হন তিনি তার শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশে তত যত্নবান হন, সচেতন হন। এখানেই পার্থক্য।

রবীন্দ্রনাথের গান চর্চায় রাগসংগীতে শিক্ষা, স্বরক্ষেপণের বৈশিষ্ট্য, গানের বাণী হৃদয়ঙ্গম করে উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যে তাকে অর্থ-বাহী করে তোলা বড়ো সহজ কাজ নয়। যা সঠিকভাবে করতে পারলেই 'রবীন্দ্রসংগীত' হয়ে ওঠে। নচেৎ নয়।

শ্রোতারা (যাদের অধিকাংশই অর্ধ শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত) তারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্পীদের তাদের রুচি অনুসারে গান করতে বাধ্য করেন। এখানেও এখনও একটি বাঁধন আছে যা ১৯৯১ সালের পর আর থাকবে না। বিশ্বভারতীর সংগীত সমিতির বাধানিষেধ যেদিন থাকবে না অর্থাৎ ১৯৯১ সালের পর 'শিল্পীর স্বাধীনতা'র অজুহাতে যে যার ইচ্ছানুসারে রবীন্দ্রনাথের গানকে সাজিয়ে নেবেন। বলা যায় না এমনটিও হতে পারে অন্তত একটি ক্ষেত্রে এখনই তা হয়। ভক্ত মণ্ডলী পরিবেষ্টিত এক 'ভারতবিজয়ীবাবা'র কণ্ঠের গান শুনে চমকে উঠেছিলাম। গানের বাণী চেনা ঠেকেছিল। তবে শব্দ নয়।

'বাণী'র পদ্ধতি অনুসারে সব শব্দ যুক্ত থাকেনি এবং সুর ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব। হাতে যে গ্রন্থটি দেখেছিলাম তার নাম 'গীতবিতান'। লেখক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আশ্চর্য হয়ে দেখেছি—সমাজে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যেও কোনো বিকার নেই।

'রবীন্দ্রনাথের গান' যখন রবীন্দ্রসংগীত আখ্যা পায়নি সেই সময়ের কিছু বিশৃঙ্খলার জের আজও চলেছে। অজস্র উদাহরণের মধ্যে মাত্র দুটি দৃষ্টান্ত গ্রহণই যথেষ্ট মনে করি। পূর্ণকুমারী দাসীর কণ্ঠে 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' গানটি রেকর্ডে প্রচারিত ও সমাদৃত হয়েছিল। অন্যটির গায়ক ছিলেন সে যুগের প্রখ্যাত গায়ক কে মল্লিক। গানটি ছিল 'আমার মাথা নত করে দাও হে'। কিন্তু এই গান দুটির সুরকার কে ছিলেন? সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে গান দুটি গাওয়া হয়েছিল যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো সম্পর্ক ছিল না। দ্বিতীয় গানটিতে 'দয়াল' শব্দটিও যোগ হয়েছিল। ১৯৯১ সালের পর সেই অবস্থা ফিরে আসবে, তখন কি ভাবে তা রোধ করা যাবে?

আরো একটি প্রশ্ন—স্বরলিপির। রবীন্দ্রনাথ নিজে যদি তাঁর নিজের সব গানের স্বরলিপি করে যেতে পারতেন তবে কথাই ছিল না। কিন্তু তাতো ঘটেনি। তাই বাধ্য হয়ে তাঁর কাছে যারা শিখেছেন এবং যারা স্বরলিপি করেছেন তাঁদের ওপর নির্ভর করতেই হয়। ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে—এক-একজনের স্বরলিপির এক-এক ধরন। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রেও স্বরলিপিকারের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু এঁরাই ধারক। সেই প্রাপ্য সম্মান দিয়ে যথাযথ স্বরলিপি অনুসরণ করলে 'রবীন্দ্রসংগীত' গাওয়ার পথ সুগম হবে।

বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের সব গান যেমন রবীন্দ্রসংগীত হয়ে ওঠেনি তেমনই যথার্থ রবীন্দ্রসংগীতগুলিকে স্বমহিম মর্যাদায় মণ্ডিত করে পরিবেশন, রূপায়ণ বা প্রচারেও অনেক ঘাটতি রয়ে যায়। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রযোজক ও রেকর্ড কোম্পানি এই তিন দলই এ ব্যাপারে দায়ী। 'হাদে গো নন্দরানী', 'আজ অসবে শ্যাম গোকুলে ফিরে' জাতীয় গান শুদ্ধ রবীন্দ্রসংগীতের আসরে গাইবার আগে বা রেকর্ড করার আগে দুবার ভাবা উচিত। 'বেঁধেছ প্রেমের পাশে' কিংবা 'দিন ফুরালো হে সংসারী' জাতীয় নিছক অনুকরণমূলক গানে কতটা রবীন্দ্রস্পর্শ আছে তাও ভেবে দেখা দরকার। একই কোম্পানি থেকে রেকর্ড করা রবীন্দ্রসংগীত যখন দু'জন শিল্পীর কণ্ঠে এখনই ছন্দে, চালে ও গায়কীতে একেবারে ভিন্ন পথের ইশারা দেয়, তখন আশংকা জাগে—১৯৯১ সালের পর আসবে কী ভয়ানক প্লাবন, কী অসহনীয় সুরধর্ষণের পালা দিন। ★

আলোকচিত্র : ইন্দিরা সংগীত-শিক্ষায়তনের সৌজন্যে



বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত চর্চা করতে হলে একলব্য সাজতে হয়

সন্‌জীদা খাতুন

বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা কেবল সংস্কৃতি চর্চা নয়। পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্র সংগীত সাধনা ছিল বাঙালীর সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাসূত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অঙ্গ। আর, স্বাধীন বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীতের সুষ্ঠু প্রচারের চেষ্টা হচ্ছে দেশজ সংস্কৃতির চর্চা সূত্রে স্বকীয় সংস্কৃতিতে স্বস্থ হবার সাধন। রবীন্দ্রসংগীত এইভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েছে।

কিন্তু পাকিস্তান আমলের প্রতিকূল বাধার কাল অতীত হলেও, রবীন্দ্রসংগীত চর্চাকারীরা এখনো নিরন্তরই অন্যতর কিছু না কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে চলেছেন।

সংগীত গুরুমুখী বিদ্যা—একথা সকলেই জানেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের কাছ থেকে শিখবার সুযোগ আমাদের নেই, তাঁরা ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী। উনিশশো চুয়াত্তর সালে আচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে কিছুদিন এদেশে এনে রেখে রবীন্দ্রসংগীতের সুষ্ঠু শিক্ষাগ্রহণের চেষ্টা হয়েছিল। বয়োভার অগ্রাহ্য করে তিনি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে বাস করে উপযুক্ত শিক্ষার দিশা দেবার চেষ্টা করেছেন। সব মিলিয়ে মাস তিনেকের মত সময় আমরা তাঁকে ধরে রাখতে পেরেছিলাম। সাধনার জন্য, যথাযথ শিক্ষাগ্রহণের জন্য এসময় নিতান্ত অপ্রতুল।

সংগীতাচার্যের এদেশে অবস্থানের শেষভাগে, তাঁকে সহায়তা দেবার জন্য তাঁর শিষ্যা শ্রীযুক্তা নীলিমা সেন এসেছিলেন বাংলাদেশে। শৈলজারঞ্জনের অপর শিষ্যা শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ও, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরে একবার ঢাকায় এসে ফাহমিদা খাতুন, হামিদা আতিক, ইফফাত আরা খান প্রভৃতি কয়েকজনকে নিয়মিত গান শিখিয়েছিলেন। কিন্তু এ শিক্ষাও অপ্রতুল।

গুরুমুখী বিদ্যার্জনের আশা ছেড়ে, রবীন্দ্র সংগীত চর্চার জন্য আমাদের প্রধানত স্বরলিপির উপরেই নির্ভর করতে হয়। আর, ভরসা করা যেত রেকর্ডের গানের উপরে। কিন্তু স্বরলিপিতে ও রেকর্ডের গানে সবসময় সামঞ্জস্য থাকে না। আমাদের কাছে অমীমাংসিত থেকে যায় 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে', 'তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে', 'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে', 'মম দুঃখের সাধন' ইত্যাদি গানের রেকর্ড এবং স্বরলিপির অমিলের রহস্য। স্বরলিপির তাল বিভাগ নির্দেশ করে সাজানো গান রেকর্ডে শুনতে পাই অনিবদ্ধ তালে। 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না', 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি', 'অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে', 'তোমায় নতুন করে পাব বলে', 'ও চাঁদ চোখের জলের লাগল জোয়ার'—এমন বহু গান স্বরলিপিতে কেন তালে বাঁধা আর রেকর্ডে কেন স্বাধীন ছন্দে গাওয়া হচ্ছে—কে বলে দেবে আমাদের। গুরুমুখ থেকে যদি একটা সর্বজনীন নির্দেশ এসে থাকে, তবে স্বরলিপি কেন সেইভাবেই বিন্যাস করা হবে না।

স্বরলিপির শুদ্ধতা নিয়েও কাগজে পত্রে তর্কবিতর্ক পড়তে পাই, সমাধান পাওয়া যায় না কিছু। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দূরকালে জন্ম নিয়ে এবং তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে আমরা যথেষ্ট অসহায় অবস্থায় আছি। তার উপরে স্বরলিপির কলহ যেন বিষফোঁড়া? অধিকারী ব্যক্তিদের কাছে প্রশ্ন করে সদুত্তর পাওয়া কঠিন। তাঁরা একত্র বসে কোন সমাধান খুঁজতেও বুঝি নারাজ। কারণ, সকলেই একে অপরের প্রতি বিরূপ। আচার্যদের লেখা প্রবন্ধে যদি বা একধারার কথা পাওয়া যায়, জ্ঞানমতে তাঁরা একে অপরকে সমর্থন করবেন না, সহ্য করবেন না। রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের আশ্চর্য সংযমের ছাপ তাঁর শিষ্যদের উপরে আছে বলে অনুভব করবার সুযোগ হল না, এমনি পোড়াকপাল আমাদের।

এদিকে দূর বাংলাদেশে বসে আমাদের দাবি ছিল, স্বরলিপিকে এমন করে তুলতে হবে—যাতে তা থেকেই যথেষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়, যাতে আন্তরিক আগ্রহ এবং অন্তর্নিহিত

ক্ষমতার সাহায্যে গুরুমুখী শিক্ষার অসদ্ভাবের সমস্যা উত্তীর্ণ হওয়া যায় !

রেকর্ডকে আদর্শ করাও এখন বিপজ্জনক। এত কায়দাতে রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হচ্ছে, কোন ঢংটি ঠিক কোনটি বেঠিক—বুঝবার উপায় কি ? তরুণ যারা, তারা কণ্ঠ-মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে পড়বে, সে অত্যন্ত স্বাভাবিক। আর আকর্ষণীয় কণ্ঠের অধিকারী যদি এখনকার আধুনিক গানের স্টাইলে গান করেন তবে তো কথাই নেই। রেকর্ডে 'হে মাধবী দ্বিধা কেন' বা 'দ্বারে কেন দিলে নাড়া ওগো মালিনী' বলবার ঝোঁকে যে চটুলতার প্রকাশ তা আধুনিক যুবাদের মনোহরণ করবে। কারণ রবীন্দ্রসংগীতের গায়নভঙ্গিতে গায়কের সঙ্গে গানের উদ্দিষ্ট জনের যে পৃথক সুরে ছন্দে আভাসিত থাকে, তা ছেঁটে ফেলে কতকগুলি ঝোঁককে প্রধান করে তুললে আশপাশের সাধারণ মানুষকে প্রত্যক্ষ আঘাতে সহজেই চঞ্চল করে তোলা যায়। আধুনিক ঝোঁক প্রত্যেকের জন্য বক্তব্য উপস্থিত করা, সুরে ছন্দে অথবা মাধুরীকে বাঁধবার সাধনা আধুনিকের নয়।

ইদানীন্তন কালে সমাজ চাইছে মারীচকে, যে সোনার হরিণের মায়ারূপে চোখ ধাঁধায়। তার আসল রূপের খোঁজ আজকে নেই, বাইরে রূপের ঝলক দেখে নৃত্য করছি আমরা। এ আদর্শ প্রাচ্য দেশে ছিল না, এসেছে পাশ্চাত্য দেশ থেকে। জীবনাচরণে একান্ত বাহিরের চাকচিক্যের অনুসারী হবার ফলে তরুণ চিত্ত গহনের সন্ধানী হতে পারছে না তাই রেকর্ডের বহু গান বিভ্রান্ত করছে নবীনদের, রবীন্দ্রসংগীত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মর্যাদা হারিয়ে ফেলছে। পপ গানের এই যুগে রবীন্দ্রনাথের গানকে নামানো হয়েছে পপুলারিটি অর্জনের প্রতিযোগিতায়।

এই কি চেয়েছিলেন তিনি ? রচনা তাঁর অথচ তাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে যে রূপ দেওয়া হচ্ছে সে রূপ কি তাঁর ধ্যানে ছিল ?

রবীন্দ্রনাথ যা চেয়েছিলেন, তাঁর আদর্শ তুলে ধরবার জন্য এই সময়ে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের একতাবদ্ধ এবং সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া ছিল জরুরী। কিন্তু, হা হতোস্মি।

এই ভয়াবহ সমস্যার পীড়নে বাংলাদেশেও আমরা জর্জর হচ্ছি। রবীন্দ্রসংগীতের চর্চায় আমাদেরকে হতে হয় একলব্য শিষ্য। রেকর্ড শুনে রেডিও শুনে দ্রোণ গুরুকে ঠিকমত চিনে নিতে হবে। একথা ঠিক যে যারা রবীন্দ্র সংগীতের শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন—তারা মোটামুটি কোন না কোন পথ বেছে নিয়ে পথ চলেছেন। কারো দ্রোণাচার্য যদি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বা সুচিত্রা মিত্র—তো কারো আবার দেবব্রত বিশ্বাস বা চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। গুরুর অনুসরণে কিছু-দূর অগ্রসর হবার পর কচিৎ কদাচিৎ স্বকীয় ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথকে অনুধাবনের চেষ্টাও দুর্লক্ষ্য নয়। এই ভাবেই চলেছে বাংলাদেশের রবীন্দ্রসংগীত চর্চা।

আগে যা বলেছি তার বাইরেও সমস্যা আছে। রাজধানীতে বা মফস্বল শহরে যেসব গৃহশিক্ষক গানের টিউশনী করেন, দু'চারখানি রবীন্দ্রসংগীত না জানলে তাদের চলে না। কারণ, দেশে মোটামুটিভাবে সাগরপারের কালচারের পৃষ্ঠপোষকতা থাকলেও রবীন্দ্রসংগীতের এটুকু চাহিদা আবার আছে। এই শিক্ষকরা একাধারে উচ্চাঙ্গসংগীত অর্থাৎ সাপা রেসা গাপা মাধা ইত্যাদি সরগমের টেলিভিশনে আদৃত ছড়া গান, নজরুলের গান এবং রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষা দিয়ে থাকেন ছাত্রছাত্রীদের। এদের রবীন্দ্রসংগীত সেই পপুলার রবীন্দ্রসংগীত—যা থেকে রবীন্দ্রনাথ বহুল পরিমাণে ছাঁটাই হয়ে গেছেন।

দোষ দেবো কি করে—নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্র সংগীতের চর্চা করতে গেলে এদের চলবে কেন ? চাহিদা যত যেখানে যেমন তেমন এক আধখানা গান গেয়ে দিতে পারে ছেলে-মেয়েরা অভিভাবকরা এরকম চান এবং মাস্টারমশাইরাও সেইমত ছেলেমেয়েদের তালিম দিয়ে দেন। বাবা মায়েরাই বা কি করবেন—সমাজের যেমন যেমন চাহিদা তেমন বুঝে শিক্ষা না দিলে এ সমাজে তাঁদের সন্তানেরা চলবে কি করে !

তাই পপুলার রবীন্দ্রসংগীতের জয় চতুর্দিকে।

রবীন্দ্রসংগীত প্রশিক্ষণের ভালো ব্যবস্থা এ সমস্যার কিছু নিরসন হতে পারে। [illegible] সরকারী পর্যায়ে হবার [illegible] মানে অবস্থার আশু পরিবর্তনের চেষ্টা ছেড়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অপেক্ষায় থাকা। এজন্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্যোগ নিতে হবে, উনিশ শো চুয়াত্তর সালে যেমন উদ্যোগ নিয়েছিলেন 'সং সংগীত প্রসার সমিতি' আচার্য শৈলজারঞ্জনকে এদেশে নিয়ে এসে।

আর একটি সৎ প্রচেষ্টা হয়েছিল 'ছায়ানট' প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুম-দারের প্রবন্ধ সংকলন 'রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ' প্রকাশে। রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনা ব্যাপক ভাবে প্রচার করে সংবেদনশীল হৃদয়ে সাড়া জাগানো প্রয়োজন। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু লেখায় আমাদের এখানে কখনো কখনো এ প্রয়াস দেখা যায়। অবশ্য বড়ই অনিয়মিত।

কলকাতার শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্র-সংগীতের সুরসুষমা ও স্বরসঙ্গতি' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে অনেকদিন হল। শ্রীগৌরীপ্রসাদ ঘোষের 'রবীন্দ্রনাথের শিল্পরূপ' গ্রন্থের শেষে ত্রিশটি রবীন্দ্রসংগীতের বিশ্লেষণ আছে। এই ধরনের বই এদেশে আমদানী হওয়া দরকার। আধুনিক জীবনে ভাবের চর্চাতেই আমরা দীন হয়ে পড়েছি। এই দিকটির উন্নয়নে যত্ন নেওয়া সমীচীন। ভাবের দিকে লক্ষ নিয়োজিত হলে রবীন্দ্রসংগীতকে আবার আমরা তার স্বকীয় মূল্যে আবিষ্কার করতে পারব।

সাধারণভাবে, এদেশে রবীন্দ্রসংগীতের চাহিদা থাকলেও জনপ্রিয়তা তত আছে বলা যাবে না। কারণ শিক্ষার অভাব, এবং উপযুক্ত মানসিকতা সৃষ্টিতে চরম অবহেলা। এ অবস্থা সামগ্রিক ভাবে দেশের জন্য অকল্যাণকর। এ কেবল রবীন্দ্রসংগীতের চর্চার বাধা নয়, জাতীয় গঠনের তথা উন্নয়নের বৃহত্তর বাধা।

জানি না কতদিনে আমরা এই দুর্লভ্য সাধনের সাধনায় সফল হতে পারব।

রবীন্দ্রসংগীত চর্চার আর একটি অসুবিধা বাংলাদেশে প্রবল। স্বরজ্ঞানের ধারণার জন্য উচ্চাঙ্গসংগীতের শিক্ষা দরকার, একথা সকলেই জানেন। কলকাতাতে আজকাল আলোচনা শুনছি যে, কেবলমাত্র উচ্চাঙ্গ-সংগীতের ধারণা আছে এমন ওস্তাদ দিয়ে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থীর উচ্চাঙ্গ সংগীতশিক্ষা চলবে না। সেই ওস্তাদ চাই, যিনি রবীন্দ্র-সংগীতও জানেন এবং এ সংগীতে শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে ছাত্রছাত্রীকে প্রয়োজনীয় রাগসংগীতের বিশেষ ধরনের পাঠ দিতে পারেন। আর, আমাদের এখানে শুধু উচ্চাঙ্গসংগীতের শিক্ষকই দুর্লভ। এখানে যাঁরা উচ্চাঙ্গ-সংগীতের পাঠ দিচ্ছেন—তাঁদের কাছ থেকে রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ এবং রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ ধরনের রাগসংগীতের পাঠ আদায়ের আশা আরও দূরে।

সমস্যার এইসব কাঁটাবনে রবীন্দ্র-সংগীতে একান্ত নিবিষ্ট হবার সুযোগ পাওয়া দুষ্কর। রবীন্দ্রসংগীত [illegible] মনোযোগ দাবি করে, [illegible] আমরা দিতে পারছি, তা [illegible]। রবীন্দ্রসংগীতের বাণী [illegible] সুর এবং ছন্দ যে মাধুরীর আভাস দেয়, তার [illegible] সাধনাসাপেক্ষ [illegible] শিল্পকর্মের মর্মোদঘাটনে যে নিত্য নতুন সৌন্দর্যের আস্বাদ পাওয়া যায় রবীন্দ্রসংগীতও সেই মহৎ আন্তর সম্পদ নিয়ে আমাদের মুখপানে চেয়ে আছে। রবীন্দ্রসংগীত সাধনার বন্ধুর পথে চলতে চলতে দুর্লভ কোন মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকের মত যখন কোন গানের বিশেষ সৌন্দর্য মনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখন বিস্মৃত পুলকে আমরা এ সাধনার পুরস্কার অন্তরে অনুভব করি। সমস্যার লাঘব হলে এ সৌন্দর্য সম্পদের আস্বাদন সুলভ হবে নিশ্চয়ই। এখন, কষ্টের সাধনা বলে, এ পুরস্কার বড়ই মহার্ঘ বলে মনে হয় আমাদের কাছে। ★

রবীন্দ্রনাথের যে গান 'অজ্ঞাত'-পরিচয় বলে রেকরড হয়েছিল

সুবীর ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের একটি গান : 'বুঝি ওই সুদূরে ডাকিল মোরে / নিশীথেরই সমীরণ হায়—হায় / মম মন হলো উদাসী', দ্বার খুলিল / বুঝি খেলারই বাঁধন ওই দ্বার। গানটি রাজেশ্বরী দত্ত কিন্তু রেকরড করিয়েছিলেন রচনা : অজ্ঞাত, ব্রহ্মসংগীত এই পরিচয়ে। হিন্দুস্থান কোমপানির (এখন ইনরেকো) এইচ-২১৪২ সংখ্যক রেকরডটি এই অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ দেবে। রেকরডটির অন্য পিঠে বিশ্বভারতী (সোসাইটি) মিউজিক বোরডের অনুমোদনের চিহ্নসহ আছে 'ধীরে ধীরে ধীরে বহ' গানটি। আর এই 'অজ্ঞাতপরিচয় গীতিকারের' গানটি সম্বন্ধে রেকরডের লেবেল থেকে জানা যাচ্ছে গায়িকা গানটি স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবীশের সৌজন্যে পেয়েছিলেন। কিন্তু আজ তো আমরা সবাই জানি—অজ্ঞাতপরিচয় সেই গীতিকার আর কেউ নন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এ ঘটনার অনেক আগে ১৯২৭ সালেও দেখি প্রায় একই ঘটনা ঘটেছিল। দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত' বই এ সন্তোষকুমার দে ও কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্যের কবিকণ্ঠ' থেকে এই 'মজার ঘটনাটি সকলের নজরে এনেছেন। দেখা যাচ্ছে—কনক দাশের একটি রবীন্দ্রসংগীতের রেকরডে রবীন্দ্রনাথের নাম নেই গান দুটি হল 'কবে তুমি আসবে বলে' ও 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে'। তবে দু'টি রেকরডের পার্থক্য অনেক। কনক দাশের রেকরডে কবির স্বীকৃতি নেই আর রাজেশ্বরী দত্তের রেকরডে কবি অস্বীকৃত। কিন্তু কেমন করে সম্ভব হয়েছিল এই অসম্ভব ঘটনা?

রবীন্দ্রনাথ জানতেন 'সবচেয়ে স্থায়ী হবে তাঁর গান' তাই বলতেন, 'আমার গান বাঙালীকে নিতেই হবে, আমার গান গাইতেই হবে সকলকে, বাংলার ঘরে ঘরে, প্রান্তরে, নদীতীরে'। তাঁর গান শুধু অনুষ্ঠান, বাহারী আসর, রেডিও, রেকরড, চলচ্চিত্র-মঞ্চের জন্যই রচিত হয়নি। রচিত হয়েছিল কাজের ফাঁকে, অবসরের আনন্দে, নিরালায় বা বন্ধু-বান্ধবের আড্ডায়, কারণে অকারণে ঘরে, ছাতে, চা-এর দোকানে এমন কি স্নানের ঘরেও গাইবার উপযোগী করে। সে-সব গানের সুরে, কথায়, ছং-এ শুদ্ধতা থাকবে কি করে? কবিও তা জানতেন। তিনি লক্ষ্য করছিলেন রেডিও-রেকরডে ভুল সুরে তাঁর গান গাওয়া হচ্ছে। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর ১৯২৬ সাল থেকেই কবি সক্রিয় হয়েছিলেন এই স্বেচ্ছাচার বন্ধ করতে।



রেকরড কোমপানিগুলির সঙ্গে কথা হয়েছিল, তাঁর গান গাইতে হলে গায়ক-গায়িকাকে ঠিক সুরটি শিখে গাইতে হবে আর ভুল সুরে গাওয়া গানের রেকরডের বিক্রি বন্ধ করতে হবে। সেই চুক্তি এখন অনেক আঁটো-সাঁটো হয়েছে। রবীন্দ্র সংগীতের 'বিশুদ্ধতা' রক্ষায় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বিশ্বভারতী মিউজিক বোরড কবির 'সবচেয়ে স্থায়ী' সৃষ্টির উপর রাখছেন কড়া পাহারা। এই সতর্ক প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়েই কি রাজেশ্বরী দত্ত—যিনি গানের জন্য রবীন্দ্রনাথের স্নেহ পেয়েছিলেন, যিনি গান শিখেছিলেন শান্তিদেব ঘোষ, ইন্দুলেখা ঘোষ, অমিতা সেন ও শৈলজারঞ্জনের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে—এই কাজটি করেছিলেন? মিউজিক বোরডের তো ক্ষমতা ছিল এই রেকরডের বিক্রি বন্ধ করে দেবার? তবে কি রাজেশ্বরী দত্ত ভুল সুরে এই গানটি রেকরডে করেছিলেন? তাই কি বোরড গানটির অনুমোদন দেননি? তাই-বা হবে কি করে? কবির মৃত্যুর পর এক রেকরড কোমপানির অনুরোধে পঙ্কজকুমার মল্লিক রবীন্দ্রনাথের দুটি গান রেকরড করেছিলেন কেবল অরগ্যান বাজিয়ে। বোরড 'too heavy music' এই কারণে রেকরডের অনুমোদন দেননি। গান দু'টি হল 'তুমি মোর পাও নাই পরিচয়' ও 'যাও যাও যদি যাও তবে'। শুধু পঙ্কজকুমার কবি অজয় ভট্টাচার্যকে দিয়ে ঐ গান দু'টির ছন্দে লেখালেন 'আমি আজ নিয়ে যাই পরাজয়' ও 'নাও মালা নাও গলে'। পঙ্কজকুমার তো নাকচ গানদুটি রচনা : অজ্ঞাত, এই ভাবে রেকরড করাতে পারতেন। পারতেন আরো অনেকেই যাদের গান অনুমোদন পায়নি বোরডের দ্বারা, তাঁরা সব ই। কিন্তু তা-তো সম্ভব নয়। কারণ, অসীম ক্ষমতাশালী মিউজিক বোরড সেই সেই রেকরড বিক্রি বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা রাখেন। তবে এ রেকরডের ক্ষেত্রে এরকম হলো কি করে? আমরা জানি বোরডের নিয়ম অনুসারে গায়ক বা গায়িকাকে তারা যে গান রেকরড করতে চান প্রথমে তার তালিকা বোরডকে পাঠাতে হয়। বোরডের মঞ্জুরনামা পেলে রেকরড করে আবার অনুমোদন নিতে হয় বোরডের কাছ থেকেই। এ যুক্তিতে মনে হয়—রাজেশ্বরী দত্ত গান দু'টি পাঠিয়েছিলেন বোরডের কাছে। তাহলে কি কারণে 'বুঝি ওই সুদূরে ডাকিল মোরে' বোরডের অনুমোদন পায়নি? না কি, রাজেশ্বরী দত্ত এবং তিনি যার সৌজন্যে এই গানের কথা ও সুর পেয়েছিলেন, সেই প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবীশ, তাঁরাই জানতেন না গানটি রবীন্দ্রনাথের? তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় যে তারা জানতেন না তাহলে প্রশ্ন ওঠে—মিউজিক বোরডের কর্তারাও কি জানতেন না।

বোধহয় জানতেন না। কারণ, জানলে রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষেত্রে 'রচনা : অজ্ঞাত' এই পরিচয় সহ্য করবার পাত্রই তারা নন। আর জানতেন না দেখেই তারা হয়ত গানটির অনুমোদন দেননি এবং রেকর্ড বিক্রি বন্ধ করতে পারেননি। অনেকেরই মন খুঁত-খুঁত করতে পারে এ কথা শুনে যে বোর্ডের কর্তারা জানেন না, প্রফুল্লচন্দ্র ও রাজেশ্বরীই খালি গানটি জানেন—এটা কেমন করে হয় প্রফুল্লচন্দ্রই বা গানটি পেলেন কোথায়? পুরনো দিনে ফিরে যেতে হবে এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য। তার আগে প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবীশ সম্পর্কে দু চারটি তথ্য জেনে রাখা দরকার।

প্রফুল্লচন্দ্র, যিনি চেনাজানা মহলে বুলা মহলানবীশ নামেই অধিক পরিচিত, তিনি ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের ছোট ভাই। শান্তিনিকেতনের ছাত্র। রবীন্দ্র সংগীতানুরাগী। খুব সুন্দর বাঁশি বাজাতে জানতেন। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি কবির 'সকল নাটের কাণ্ডারী, আমার সকল গানের ভাণ্ডারী' ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর যারা গানের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন কবির আস্থাভাজন ছিলেন, প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তাঁদেরই একজন। রবীন্দ্রসংগীত যাতে ঠিক ভাবে শেখানো হয় তার জন্যে ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর সহায়তায় উনি স্থাপন করেছিলেন 'গীতালি' নামে এক সংগীত-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান সম্বন্ধে বলেছেন, 'আমার গান আপন মনের গান—তাতে আনন্দ পাই, শুনলে আনন্দ হয়। গান হবে যাতে যারা আশেপাশে থাকে তারা খুশি হয় আত্মীয়স্বজন যারা অফিস থেকে আসছে, দূর থেকে শুনতে পেলেও এটা তাদের জন্যও ভালো। ঘরে মাঝে মাঝে ঝগড়াও তো হয়—গান ঘরের মধ্যে মাধুরী পাওয়ার জন্যে, বাইরের হাততালি পাবার জন্যে নয়।' তারপর আক্ষেপ জানালেন, 'এখন এমন হয় যে আমার গান শুনে নিজের গান কিনা বুঝতে পারি না। মনে হয় কথাটা যেন আমার, সুরটা যেন নয়। নিজে রচনা করলুম, পরের মুখে নষ্ট হচ্ছে, এ যেন অসহ্য। মেয়েকে অপাত্রে দিলে যেমন সবকিছু সইতে হয়, এও যেন আমার পক্ষে সেই রকম'। অবশেষে প্রফুল্লচন্দ্রকে লক্ষ্য করে বললেন, বুলা বাবু, তোমার কাছে সানুনয় অনুরোধ—এদের একটু দরদ দিয়ে, একটু রস দিয়ে গান শিখিয়ো—এইটেই আমার গানের বিশেষত্ব।—আমার গানে যাতে একটু রস থাকে, তান থাকে, দরদ থাকে ও মীড় থাকে, তার চেষ্টা তুমি কোরো'।

রবীন্দ্রনাথের 'বুলা বাবু' তখনকার তরুণ গায়ক গায়িকাদের কাছে ছিলেন 'বুলাদা'। দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর বইতে লিখছেন : 'রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে আমি যাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও স্নেহ এককালে পেয়েছিলাম, তাদের অনেকেই আজ জীবিত নেই। তাদের



মধ্যে অনেকের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আত্মীয়তা ছিল এবং অনেকেই তাঁর স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। তারা ছিলেন—ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণী, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীর ঠাকুর, প্রশান্ত মহলানবীশ, প্রফুল্ল মহলানবীশ...' আর এক জায়গায় পাচ্ছি শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত কালোর চায়ের দোকানে গানের স্মৃতি প্রসঙ্গে, 'প্রথমে আমার একলার গান, তারপর কোরাস গান সবাই মিলে। কালোর দোকানের সামনেও ভিড় জমে যেত। বুলাদা পকেট থেকে বাঁশী বার করে গানের সঙ্গে বাজিয়ে যেতেন...'। এই হচ্ছে প্রফুল্লচন্দ্র বা বুলা মহলানবীশের এই প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এবার বুঝি 'ওই সুদূরে ডাকিল মোরে' গানের প্রসঙ্গে আবার ফিরে যাওয়া যাক।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন—১৩৩০ সনের ৮, ১০, ১১ ভাদ্র কলকাতার এম্পায়ার মঞ্চে 'বিসর্জন' অভিনীত হয়েছিল (ইংরেজি ২৫, ২৭ ২৮ অগাস্ট, ১৯২৩)। এই অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, তপন-মোহন চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু ঠাকুর, সংজ্ঞা দেবী, রাণু অধিকারী (এখন যিনি 'লেডি' রাণু) ও আরো অনেকে।

গীতবিতানের গ্রন্থপরিচয় থেকে জানতে পারছি—'বুঝি ওই সুদূরে ডাকিল মোরে' গানটি ১৩৩০ সনে বিসর্জন নাটকে গাওয়া হয়েছিল। এই অভিনয়ে সাহানা দেবীও গান করেছিলেন কবির ইচ্ছায়। বিসর্জন অভিনয়-এর স্মৃতিকথায় সাহানা দেবী জানান যে, তাঁর গলায় 'দিন ফুরালো হে সংসারী' গানটি শুনে "গোটা দশেক গান দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবার কেও এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেন"। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই নাটকে প্রফুল্লচন্দ্র বা 'বুলাবাবু'র ভূমিকা কি ছিল? এ সম্বন্ধে কোন তথ্য পাই না। শুধু জানা যায় তিনি দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্র রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে এই অভিনয়ে জয়সিংহ বেশে রবীন্দ্রনাথের যে ছবিটি মুদ্রিত আছে, গ্রন্থপরিচয় থেকে জানি "ছবিটি প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবীশ কর্তৃক অভিনয়মঞ্চে গৃহীত হইয়াছিল"। এমন অনুমানও করা যায় যে, রিহার্সালের সময় প্রফুল্লচন্দ্র হাজির থাকতেন। সেই সময়েই গানটি তিনি শুনেছিলেন। কবি শঙ্খ ঘোষের কাছে জেনেছি প্রফুল্লচন্দ্র গানটি বাঁশিতে তুলে নিয়েছিলেন। শঙ্খবাবু নিজে প্রফুল্ল-চন্দ্রের বাঁশিতে গানটি শুনেছিলেন তাঁর ছাত্রাবস্থায়।

মনে হচ্ছে রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে। ঘটনাটি যেভাবে বিবৃত করা হলো প্রকৃতপক্ষে এ সব কিছুই এতো সহজ সরল ছিল না। কারণ রাজেশ্বরী দত্তের রেকর্ডটি যখন বের হয়, তখনো গানটি 'গীতবিতান'-এ ঠাঁই পায়নি। অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল কি না তারও কোন হদিশ এখনো পাওয়া যায়নি। প্রফুল্লচন্দ্র অনেকেরই অনুরোধে

গানটি যাতে বিলুপ্ত না হয়ে যায়, তার জন্যে রাজেশ্বরী দত্তকে দিয়ে রেকরড করিয়েছিলেন। অনুমান অসঙ্গত নয় যে, প্রফুল্লচন্দ্র মিউজিক বোরডকে গানটির ইতিহাস জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে ইতিহাস তখন হয়তো কর্তাদের কাছে গ্রাহ্য হয়নি। ফলে নিরুপায় হয়ে তিনি রাজেশ্বরী দত্তকে পরামর্শ দিয়েছিলেন 'রচনা ঃ অজ্ঞাত' এই ভাবেই রেকরডটি করতে। রাজেশ্বরী এবং রেকরড কোমপানি প্রফুল্লচন্দ্রের পরামর্শ মেনে নিয়েছিলেন দেখেই হয়তো একটি অপূর্ব গান বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেল না। আর কবির 'বুলাবাবু'র হয়তো মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথেরই কথা ঃ

'শুধায়োনা কবে কোন্ গান
কাহারে করিয়াছিনু দান।
পথের ধূলার পরে'
পড়ে আছে তারি তরে
যে তাহারে দিতে পারে মান।'

রেকরডটি যখন বেরোয় তখন প্রফুল্লচন্দ্র আর জীবিত নেই এবং গায়িকাও দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু নেপথ্যে হয়তো অনেক কিছুই ঘটেছিল। কারো কারো স্মৃতি হয়তো ছিল তীক্ষ্ণ! রেকরডটি বেরোবার পরে 'গীতবিতান'-এর যে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল ১৩৭১ সালে, তার ভূমিকায় পেলাম ঃ "বর্তমান সংস্করণে নূতন যোগ করা হইল— ৮৫৭ পৃষ্ঠায় ৭৯-সংখ্যক গান ঃ বুঝি ওই সুদূরে ডাকিল মোরে ইত্যাদি।"

গানের পরিচয়ে সম্পাদক স্বীকৃতি জানিয়ে লিখলেন ঃ "স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র (বুলা) মহলানবীশের নিকট ইহার কথা ও সুর পাওয়া গিয়েছিল। সম্প্রতি শ্রীমতী সাহানা দেবী এই গান টেপ-রেকরডে গাহিয়াছেন; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে তাহার সহিতও মিলাইয়া দেখা হইয়াছে।" সব ভালো যার শেষ ভালো। কিন্তু সৌজন্যের খাতিরে না হোক, ইতিহাসের প্রয়োজনে রাজেশ্বরী দত্তের রেকরডটির উল্লেখ থাকা কি প্রয়োজনীয় নয়? এই সংস্করণের পরে আরো অন্তত দু'টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কোন সংস্করণেই রাজেশ্বরী দত্তের রেকরডের উল্লেখ নেই।

তবে কি রাজেশ্বরী দত্তের রেকরডের কথা ও সুরের সঙ্গে সাহানা দেবীর টেপ-এ ধরা গানটির কথা ও সুরের ফারাক আছে? তাহলে তো আরো বেশি প্রয়োজন এসব তথ্য জানানো। সাহানা দেবীর টেপটি শোনবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। তাই সুরের পার্থক্য আছে কি না বলা যাচ্ছে না। কিন্তু কথা? রাজেশ্বরী দত্তের রেকরডে পাই ঃ

'বুঝি ওই সুদূরে ডাকিল মোরে



রাজেশ্বরী দত্ত

নিশীথেরই সমীরণ হায়
মম মন হল উদাসী; দ্বার খুলিল
বুঝি খেলারই বাঁধন ওই যায়।

একটি ছোট্ট অমিল লক্ষ্য করা যাচ্ছে দ্বিতীয় কলিতে। 'গীতবিতান'-এর পাঠ অনুসারে 'নিশীথেরই সমীরণ হায়– হায়'। রাজেশ্বরী গলায় দ্বিতীয় 'হায়'টি নেই।

গানটি প্রসঙ্গে দু'টি জরুরি তথ্য মনে রাখা দরকার ঃ (১) গীতবিতান সম্পাদক ও রাজেশ্বরী দত্ত এই গানটি পেয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে; (২) গানটি ১৩৩০ সনে বিসর্জন-এ গাওয়া হয়েছিল এবং সাহানা দেবী ঐ নাটকের অভিনয়ে গান গেয়েছিলেন। গীতবিতান সম্পাদক সাহানা দেবীর টেপের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের সূত্রে পাওয়া কথা মিলিয়ে নিয়েছেন।

সাহানা দেবীর গলার এই গানটি প্রসঙ্গে আমরা আরো একটি তথ্য জানতে পারি ভাস্কর চৌধুরীর সূত্রে। বছর চারেক আগে কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে ভাস্করবাবু এই গানটি রবীন্দ্রসংগীত পরিচয়ে গেয়েছিলেন। ফলে কিছু প্রতিবাদ ওঠে, তখন ভাস্করবাবু কাগজে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন গানটি তিনি সাহানা দেবীর কাছে শিখেছিলেন এবং তাঁর কাছে শুনেছেন রবীন্দ্রনাথ গানটি নিজে সাহানা দেবীকে শিখিয়েছিলেন।

যে তথ্য আমরা জানি না, তা হচ্ছে প্রফুল্লচন্দ্র গানটি সাহানা দেবীর গলায় শুনে বাঁশিতে তুলে নিয়েছিলেন না রবীন্দ্রনাথের গলায় শুনে? এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? কিন্তু মিউজিক বোরড এবং গীতবিতান সম্পাদক নিশ্চয়ই জানাতে পারেন কেনই-বা তাঁরা প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে জেনেও গানটিকে প্রথমে স্বীকৃতি দিলেন না আর কোন কারণেই বা তাঁকেই পরে এই গানের কথা ও সুরের অথরিটি মেনে নিলেন?

গীতবিতান-এর সম্পাদক জানিয়েছেন— গানটি ১৩৩০ সালে বিসর্জন নাটকে গাওয়া হয়েছিল। সাহানা দেবী তাঁর স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন গোটা দশেক গান সেবার গাওয়া হয়েছিল। তার তালিকাও তিনি দিয়েছেন। প্রভাতকুমার কিন্তু জানাচ্ছেন চোদ্দটি গান সেবার গাওয়া হয়েছিল। তার তালিকাও রবীন্দ্রজীবনীর তৃতীয় খণ্ডে তিনি দিয়েছেন। সাহানা দেবী উল্লেখিত দশটি গান প্রভাতকুমারের তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে। তবে দু'জনের কারোরই তালিকায় 'বুঝি ওই সুদূরে ডাকিল মোরে'র উল্লেখ নেই। 'গীতবিতান ঃ কালানুক্রমিক সূচী'র দ্বিতীয় খণ্ডে প্রভাতকুমার গীতবিতান-এর সম্পাদকের বক্তব্য মেনে নিয়ে জানাচ্ছেন "১৩২৯ সালে বসন্তোৎসবের জন্য হিন্দিগান ভাঙিয়া রচিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'যাওয়া-আসারই এই কি খেলা' গানটি গাওয়া হয়। শ্রীমতী সাহানা দেবী এইরূপ বলেন। স্বরলিপি নাই।"

'কবির সংস্পর্শে' নামক লেখায় সাহানা দেবী ১৩২৯-এর বসন্তোৎসব এর কথা লিখেছেন। ঐ লেখা থেকে জানি ঃ 'প্রেম ভগরিয়া সে ন করো' ভেঙে রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন 'যাওয়া-আসারই এই কি খেলা' গানটি। কিন্তু এ-লেখাতেও 'বুঝি ওই সুদূরে ডাকিল মোরে'র উল্লেখ পাচ্ছি না।

সুতরাং, এখনো যে সব প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি না তার সমাধানের দায়িত্ব নিতে হবে 'গীতবিতান' সম্পাদক তথা বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগকে, বিশ্বভারতী মিউজিক বোরডকে এবং আশা করবো রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শোনাবেন নেপথ্যের চাঞ্চল্যকর ঘটনাগুলি তাঁর মিউজিক বোরডের কাছে অনুরোধ—স্বরলিপি নেই এই অজুহাতে যেন গানটি তাঁরা মুছে না ফেলেন। সাহানা দেবী ও রাজেশ্বরী দত্তের দু'জনের গলায় গাওয়া এই গানটি কি আমরা সকলে শোনবার সুযোগ পাবো না? ★


চিন্তা ভাবনা অনেক কিছুই বদলে গেছে,
বদলায়নি শুধু একটি.....
সঞ্চয়ের জন্য ভাবনা
কিন্তু আজও বদলায়নি।
ঠাকুরদা সঞ্চয় করেছেন।
বাবা করেছেন। ছেলে করছেন এবং তাঁর
ছেলেও করবে।
সেই সঞ্চয়ের চিন্তাকে যাতে বাস্তবে রূপ দেওয়া
যায় তার জন্য আমরা নিরন্তর
চেষ্টা করে চলেছি।
(স্থাপিত ১৯৩২)
দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স
এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ
রেজিস্টার্ড অফিস : পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্ল্যানেড ইস্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯



রবীন্দ্রকাহিনী চলচ্চিত্রায়ণের প্রধান অসুবিধা সংলাপ

শিখা দাস

বাংলা চিত্র-নির্মাতাদের রবীন্দ্রনাথের কাহিনী নিয়ে ছবি করার বিশেষ একটি প্রয়াস লক্ষ করা গেছে বহুদিন ধরেই। একই গল্প নিয়ে একাধিক চিত্র-নির্মাণের দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে, তবু পুরনো এবং আধুনিক যুগের প্রায় সব প্রতিষ্ঠিত চিত্র-পরিচালকরাই রবীন্দ্রকাহিনী নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন এবং সেই সঙ্গে এইসব ছবিতে অভিনয় করেছেন দুই যুগেরই বিখ্যাত শিল্পীরা। দর্শকেরা নিশ্চয় রবীন্দ্র-কাহিনীর চিত্ররূপ দেখতে ভালোবাসেন, না হলে এই ছবিগুলি তৈরি করাই হতো না। অথচ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি মাত্রেই বেশ কিছুটা বুদ্ধি চিন্তা ও মননশীলতার দাবি রাখে। পরিচালকেরা কি ভেবে রবীন্দ্রকাহিনী নির্বাচন করেন, ছবি তৈরির সময় তাদের চিন্তা বা কার্যপ্রণালী কি, যে শিল্পীরা এইসব ছবিতে অভিনয় করেছেন, তাদের অভিজ্ঞতাই বা কি ধরনের—এমনি কিছু প্রশ্ন নিয়ে গিয়েছিলাম আজকের কয়েকজন চিত্র-পরিচালক এবং শিল্পীদের কাছে।

পূর্ণেন্দু পত্রী পরিচালিত চারটি ছবির মধ্যে দুটিই রবীন্দ্রনাথের কাহিনী নিয়ে—'স্ত্রীর পত্র' ও 'মালঞ্চ'। ওঁকে প্রশ্ন করেছিলাম—প্রথম ছবি 'স্বপ্ন নিয়ে'র পর জীবনের দ্বিতীয় ছবিতেই উনি রবীন্দ্রকাহিনীকে বেছে নিলেন কেন?

'স্ত্রীর পত্র গল্পটির উপর অনেকদিন থেকেই আমার একটা আকর্ষণ ছিল; অনেক ভেবেছি এই গল্পটি নিয়ে। —তবে কোন গল্প নিয়ে ছবি করতে গেলে শুধু তা পড়তে ভালো লাগলেই চলে না, আগে দেখা দরকার সেই গল্পের মধ্যে ফিল্মিক এলিমেন্ট কতটা আছে।" স্ত্রীর পত্রে কাহিনীর পুরোটাই বলা হয়েছে স্বামীর কাছে লেখা মৃণালের একটি চিঠির মধ্য দিয়ে। পূর্ণেন্দু-বাবুর বারবার করে মনে হয়েছে এর মধ্যে একটি ভালো ছবি তৈরি করার সবরকম উপাদান লুকিয়ে রয়েছে। এই গল্পের সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করা যায় না। মৃণাল যেভাবে তার চারপাশের সবকিছু তুচ্ছতা আর ক্ষুদ্রতাকে ছাড়িয়ে উঠে নিজেকে শুধু মেয়ে হিসেবে নয় একজন স্বতন্ত্র মানুষ হিসাবে উপলব্ধি করল—তা সার্থক ভাবে ফুটিয়ে তোলা চিত্র-পরিচালকের কাছে একটা চ্যালেনজের মত। 'তাছাড়া'—পূর্ণেন্দুবাবু একটু থেমে বললেন, 'স্ত্রীর পত্র'-র চিত্রনাট্য তৈরি করেছিলাম অনেকদিন আগে। যখন দ্বিতীয় ছবি তৈরির সময় এলো, ভালো গল্পের খোঁজে ছিলাম; হঠাৎ দেখি চিত্রনাট্য তৈরির পর থেকে কেমন মমতায় জড়িয়ে পড়েছি এই গল্পের সঙ্গে। এই জড়িয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক। তাই স্ত্রীর পত্র নিয়ে কাজ শুরু করলাম—সম্ভব হলো এই কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণ।"

সাধারণ ভাবে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর মধ্যে যা কিছু ইঙ্গিতে বলা থাকে, সেগুলোকে স্পষ্ট করে ছবিতে রূপ দেওয়া পরিচালকের কাজ এবং চিত্রনাট্য তৈরির সময় সেই কথা মাথায় রাখতে হয়। অবশ্য যে কোন ভালো কাহিনীর পক্ষেই একথা প্রযোজ্য। কিন্তু সাধারণ মানের কোন গল্পের ক্ষেত্রে অনেক বেশি ভাবতে হয়, কারণ ঐ গল্প-গুলোর মাঝে অনেক ফাঁক থাকে। সেগুলোকে কল্পনাশক্তি দিয়ে ভরিয়ে নিতে হয় ছবির পরিচালককে। 'তাই সাধারণ মানের গল্প নিয়ে ছবি করতে গেলে পরিচালকের পক্ষে সৃষ্টিশীল হওয়ার সুযোগ থাকে অনেক বেশি।' পূর্ণেন্দুবাবু বললেন—অন্য ছবির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থেকে যায়, রবীন্দ্র-কাহিনীতে অনেক বেশি সংযম প্রয়োজন। তবে রবীন্দ্রনাথের গল্পের চিত্রনাট্য করতে গেলে সর্বপ্রধান অসুবিধা সংলাপ। তাঁর লেখা সংলাপ সহজভাবে বলা অত্যন্ত অসুবিধে। সংলাপকে যাতে বোঝা যায় সেইমত রেখে আবার তাকে সহজভাবে বলার প্রয়োজনমত ঠিক করে নিতে হয়। মালঞ্চ-র চিত্রনাট্য তৈরির সময় উনি সব থেকে অসুবিধায় পড়েছিলেন নীরজার অসুখটা ঠিক কি, দেহের না মনের—এই সমস্যায়। কারণ এ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত কাহিনীতে ছিল না। অবশেষে ওঁর মনে হয়েছে—নীরজার মানসিক অসুস্থতাই বেশি। পূর্ণেন্দুবাবু বললেন 'রবীন্দ্র-কাহিনীর' চিত্রনাট্য তৈরির সমস্যা যে



"মালঞ্চ" (পূর্ণেন্দু পত্রী)—মাধবী, ধ্রুব-



'ক্ষুধিত পাষাণ' (তপন সিংহ)— রাধামোহন, সৌমিত্র

অন্য কাহিনীর থেকে খুব একটা আলাদা তা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেই তার দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়।'

শিল্পী নির্বাচনের সময় তার বক্স অফিস নিয়ে উনি চিন্তা করেন না। শিল্পীর চেহারা, অভিব্যক্তি, গলা এসব কিছু চরিত্রের সঙ্গে মিলছে কিনা এটাই ওঁর লক্ষ্য থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শিল্পী নির্বাচনের পর যদি সেই শিল্পীর বক্স অফিস থেকে যায় তবে তো ভালোই—বিশেষ করে ছবির প্রযোজকের দিক থেকে। যেহেতু হালকা রসের সহজ ছবিতে দর্শক মনোরঞ্জনের উপাদান অনেক বেশি, টিকিট ঘরের কথা চিন্তা করে প্রযোজকেরা তাই সেই ধরনের ছবিতেই টাকা ঢালতে চান। রবীন্দ্রনাথের ছবি করতে রাজি হলেও তাঁদের চিন্তা ছবিতে অন্তত দু-একজন বক্স অফিস শিল্পী নিয়ে। উনি বললেন, রবীন্দ্রসংগীতকে কিন্তু সাধারণ ভাবে ছবিতে গান বলে ধরা হয় না। যদি কোন ছবিতে দুটি রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার থাকে, চিত্র ব্যবসায়ীরা বলেন যে ওটা তো রবীন্দ্রসংগীত, গান কটা আছে? অথচ দর্শকেরা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখেন—সব শ্রেণীর দর্শক নিশ্চয় না, কিন্তু যারা বোদ্ধা দর্শক, ভালো ছবি ভালোবাসেন, তাদের কাছে এইসব ছবির যথেষ্ট আবেদন আছে। ক্রমে ক্রমে, ভালো ছবির সংখ্যা বাড়িয়ে দর্শকদের রুচির মান উন্নত করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের কাহিনী নিয়ে তৈরি ছবি নিশ্চয় টিকিট ঘরের বিক্রি বাড়াতে সক্ষম হবে। চলে আসার আগে আমার শেষ প্রশ্ন ছিল, রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে আবার কি ছবি করার কথা ভাবছেন? খুব দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন পূর্ণেন্দুবাবু, "ভালো গল্পের অভাব, তাই রবীন্দ্রনাথের কাহিনী নিয়ে ছবি করার কথা নিশ্চয় আবার ভাববো। তবে সবকিছু সুযোগ ঘটা চাই তো। তাই কবে কোন গল্প নিয়ে আবার ছবি করব, তা এক্ষুণি বলতে পারছি না।"

অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গিয়েছিলাম রবীন্দ্রকাহিনীর ছবিতে অভিনয় করা সম্পর্কে ওঁর অভিজ্ঞতার কথা কিছু জানতে। ওঁর বক্তব্য খুব স্পষ্ট। এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাহিনী-ভিত্তিক পাঁচটি ছবিতে অভিনয় করেছেন। জীবনের দ্বিতীয় ছবিই রবীন্দ্রনাথের কাহিনী নিয়ে—'ক্ষুধিত পাষাণ', পরিচালক তপন সিংহ। তারপর সত্যজিৎ রায়ের ছবি—তিন কন্যার শেষ অংশ 'সমাপ্তি'তে অপূর্ব আর পরে 'চারুলতা'য় অমল। অজয় করের সঙ্গে 'মাল্যদান' আর কিছুদিন আগে মুক্তি পাওয়া ছবি 'নৌকাডুবি'। রবীন্দ্রকাহিনীর ছবিতে অভিনয় করে উনি খুশি। "বিশেষ করে মানিকদার সঙ্গে কাজ করা তো যে কোন সময়ই খুব উত্তেজনার ব্যাপার।" প্রথম ছবি 'ক্ষুধিত পাষাণ' এত দীর্ঘদিন আগের যে সে বিষয় ওঁর স্মৃতি বিশেষ উজ্জ্বল নয়, চরিত্রটিও বিশেষ জটিল ছিল না। খুব ভালো লেগেছিল 'সমাপ্তি'র অপূর্বর চরিত্রে অভিনয় করে—কমবয়সী, সরল, সুন্দর, রোমান্টিক একটি ছেলের চরিত্র। সৌমিত্রবাবু বললেন 'আমার বয়স তখন খুব বেশি না হলেও অপূর্বর বয়সকে পার হয়ে এসেছি। তাই ঐ বয়সের সরলতা, ভুল-ভ্রান্তির চেহারাটা পরিহাস-তরল দৃষ্টি নিয়ে আমি খুব স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম, অভিনয় করেও যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি।' রবীন্দ্রকাহিনীতে নিজের অভিনীত দুটি চরিত্র ওঁর সব থেকে প্রিয়—অপূর্ব আর চারুলতায় অমল। উনি বললেন, অমল কোন জটিল চরিত্র নয়। নামের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তার চরিত্রের ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। চারুর জীবনের বদ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে অমল যেন এক ঝলক হালকা হাওয়া। নামটি শুনতেও সহজ, আর মানেও সুন্দর। এইরকম একটা সহজ সুন্দর চরিত্রে রূপ দিয়ে তাই ওঁর এত ভালো লেগেছিল।



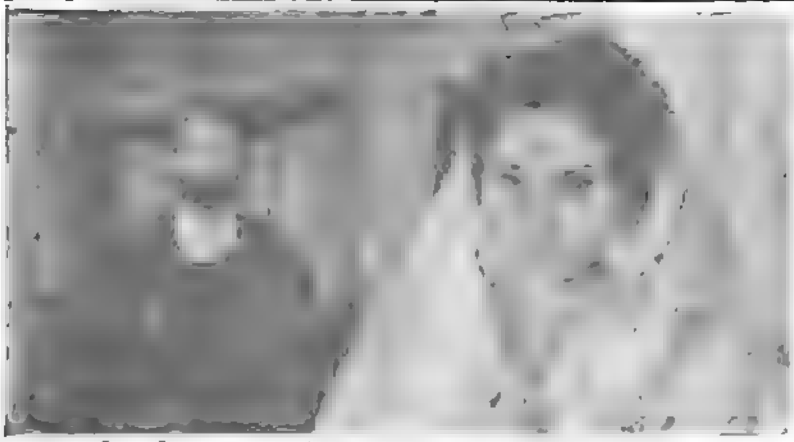
'চারুলতা' (সত্যজিৎ রায়)—মাধবী

রবীন্দ্রকাহিনীতে অভিনয় করার আলাদা কোন এ্যাপ্রোচে উনি বিশ্বাস করেন না। যে কোন জটিল চরিত্রই ওঁকে ভাবায়। রবীন্দ্রকাহিনীর চরিত্রে আলাদা কোন জটিলতা নেই। 'অশনি সংকেত', 'অভিযান', 'সংসার সীমান্তে' বা 'গণদেবতা' এই ছবিগুলিতে ওঁর অভিনীত চরিত্রগুলিকেও যথেষ্ট জটিল ও কঠিন বলে ওঁর নিজের মনে হয়েছে। চিত্রনাট্য বর্ণিত ঘটনাগুলোর মাঝে সবসময়ই অনেক না বলা কথা থাকে—যা অভিনেতাকে ভেবে নিতে হয়। না হলে কখনোই সার্থক চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব নয়। রবীন্দ্র সৃষ্ট চরিত্র ওঁর কাছে কোন ভাবেই অবাস্তব নয়। 'বরং' উনি বললেন, 'অনেক ছবির গল্প মাঝে মাঝে এত খারাপ থাকে যে সে চরিত্রগুলোর অবাস্তবতা দূর করে তার লজিক খুঁজে পেতে বেশি চিন্তার প্রয়োজন।' ওঁর মতে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে অভিনয়ের একটাই অসুবিধে, তা হল সংলাপ। ঐ সংলাপকে প্রয়োজনমত বদলিয়ে না নিলে অভিনয় করা খুব কঠিন।

'যে তিনজন পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছি, তার মধ্যে সত্যজিৎ রায় শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে কাজ করেও ভালো



'নৌকাডুবি' (অজয় কর)—প্রণতি, সৌমিত্র



মাধবী ও সমীর পত্রী—'স্ত্রীর পত্র'/'স্ত্রীর পত্র'

লেগেছে—যদিও ক্ষুধিত পাষাণ ছবির চিত্রনাট্য আমার ভালো লাগেনি'—বললেন সৌমিত্রবাবু। অশরীরী আত্মাকে অতখানি প্রত্যক্ষ শরীরী চেহারা দেওয়া ওঁর পছন্দ না। ক্যামেরার সাহায্যে ঐ চরিত্রের জন্য কোন অলৌকিক উপস্থাপনা অনেক বেশি যুক্তিপূর্ণ হত। তপন সিংহ খুব গুছিয়ে ছবি করেন এবং রবীন্দ্রকাহিনীর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও যত্নের প্রমাণ ওঁর ছবিতে আছে। রবীন্দ্রকাহিনীর প্রতি সৎ থেকে পরিচ্ছন্ন ছবি করতে পারলে তা দর্শকদের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয় না—নৌকাডুবি তার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের ছবির নায়ক রূপে ওঁর অভিনয় দর্শকদের ভালো লেগেছে। কিন্তু ওঁর ধারণা, চারুলতার অমলকে দর্শকরা যত না মনে রেখেছেন তার থেকে অনেক বেশি করে তাদের মনে আছে অভিযান ছবিতে ওঁর অভিনয়ের কথা।

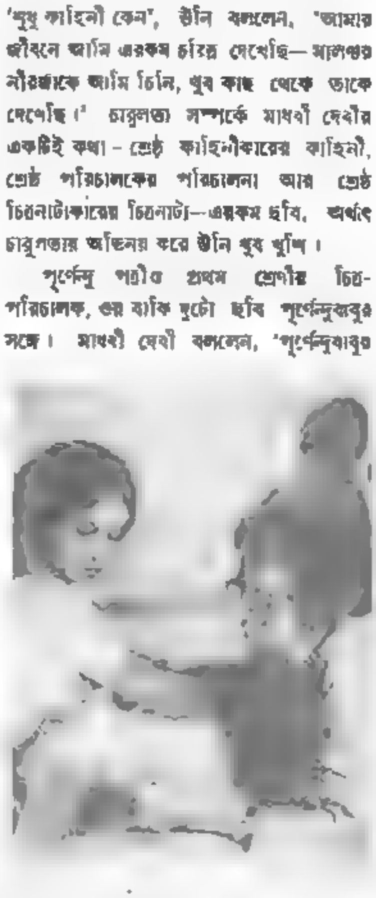
রবীন্দ্রকাহিনীর ছবিতে অভিনয় করতে গেলে যে আলাদা কোন শিক্ষা বা মানসিকতার দরকার, এ কথায় সৌমিত্রবাবু বিশ্বাস করেন না। সার্থক শিল্পী হতে গেলেই তার যথেষ্ট শিক্ষা ও চিন্তাশক্তি থাকা প্রয়োজন যাতে সে চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ করে বুঝতে পারে, কোন অলৌকিক ঘটনাকে যুক্তিসম্মত বাস্তব চেহারা দিতে পারে। রবীন্দ্রকাহিনীর চরিত্র আলাদা কিছু নয়, যে কোন ভালো চরিত্রই শিল্পীকে ভাবায়, তার কাছে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জের মত আসে—বললেন উনি।

একই প্রশ্নগুলি নিয়ে গিয়েছিলাম অভিনেত্রী শ্রীমতী মাধবী চক্রবর্তীর কাছে: রবীন্দ্রনাথের তিনটি কাহিনীর নায়িকা—'চারুলতা'র চারুলতা, 'স্ত্রীর পত্র'তে মৃণাল আর 'মালঞ্চ'র নীরজা। প্রথমটির পরিচালক সত্যজিৎ রায়, আর বাকি দুটি ছবি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। মাধবী দেবী আজ পর্যন্ত বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন, কিন্তু এই আশ্চর্য তিনটি চরিত্রকে দর্শকেরা বোধহয় কোনদিন ভুলতে পারবেন না। জটিল চরিত্রগুলিতে কি অসাধারণ সহজ ওঁর অভিনয়। ওঁর উত্তর দেবার ভঙ্গীও খুব সহজ। "এই তিনটি কঠিন চরিত্রে রূপ দিতে এতটুকু অসুবিধেও আমার হয়নি, বরং এরা এদের বাস্তবতা নিয়ে আমার সামনে ভীষণ ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এরা প্রত্যেকে আমার চেনা, এদের দেখেছি আমি।" তাই মাধবী দেবীর কাছে রবীন্দ্রনাথের কোন চরিত্র অবাস্তব তো নয়ই, বরং অন্য অনেক চরিত্রের থেকে এই চরিত্রগুলিতে রূপদান করা ওঁর কাছে খুব সহজ বলে মনে হয়েছে, ভালো লেগেছে। অন্য গল্পের চরিত্রগুলিতে অনেক সময় নানা ফাঁক থাকে—যা অভিনয় দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে অনেক পরিশ্রম আর চিন্তার প্রয়োজন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ লেখক, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোও খুব স্পষ্ট। চরিত্র যেমন করে ফুটিয়ে তুলতে হবে, তার সব উপাদানই দেওয়া রয়েছে কাহিনীর মধ্যে। 'শুধু কাহিনী কেন', উনি বললেন, 'আমার জীবনে আমি এরকম চরিত্র দেখেছি—মালঞ্চর নীরজাকে আমি চিনি, খুব কাছ থেকে তাকে দেখেছি।' চারুলতা সম্পর্কে মাধবী দেবীর একটিই কথা – শ্রেষ্ঠ কাহিনীকারের কাহিনী, শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পরিচালনা আর শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকারের চিত্রনাট্য—এরকম ছবি, অর্থাৎ চারুলতায় অভিনয় করে উনি খুব খুশি।

পূর্ণেন্দু পত্রীও প্রথম শ্রেণীর চিত্র-পরিচালক, ওর বাকি দুটো ছবি পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে। মাধবী দেবী বললেন, 'পূর্ণেন্দুবাবুর কাছে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি কেমন করে ভালো ছবি তৈরি করা যায় চরম আর্থিক অসুবিধে সত্ত্বেও—যদি ভালো ছবি করার ইচ্ছেটা সত্যি হয়।' মালঞ্চ ওঁর কাছে নিখুঁত ছবি, স্ত্রীর পত্র-র থেকেও মালঞ্চ ছবিতে নীরজার অর্ধেকেরও বেশি অভিনয় বিছানায় শুয়ে—নীরজা তখন অসুস্থ। একই ঘর, মোটামুটি ভাবে একই ফ্রেম, বিভিন্ন কমপোজিশনে অভিনয়ের সুযোগ খুব কম। তাই মাধবী দেবীর নিজের খুব সন্দেহ ছিল ওঁর অভিনয় দর্শকদের ক্লান্ত করবে কিনা। কিন্তু সত্যজিৎ রায় মালঞ্চ দেখে ওঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, তাতেই উনি খুশি রবীন্দ্রকাহিনীর নায়িকা রূপে দর্শকেরা ওঁকে কিভাবে নিয়েছেন এই প্রশ্নের উত্তরে উনি বললেন, বেশি আর কি বলব, এখনও দেশ-বিদেশ থেকে চিঠি আসে আমার কাছে চারুলতায় আমার অভিনয় তাদের কত ভালো লেগেছে সেই কথা জানিয়ে।' স্ত্রীর পত্রে মৃণালের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে উনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৭৩ সালে। দর্শকেরা যদি ওঁকে চান, তবে ভালো পরিচালকের কাছে কাজের সুযোগ পেলে উনি রবীন্দ্রকাহিনীর আরো ছবিতে অভিনয় করতে ইচ্ছুক।

রবীন্দ্রসৃষ্ট কাহিনীর ছবিতে অভিনয়ের জন্যে আলাদা করে কোন বিশেষ শিক্ষা বা মানসিকতার প্রয়োজন—এ চিন্তার সঙ্গে উনি একমত নন। ভালো অভিনেত্রী হতে গেলেই চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ করে বুঝবার মত মানসিকতার প্রয়োজন, তা না হলে চরিত্রটি স্পষ্ট হবে কেমন করে। আর শিক্ষার দরকার তো সব ছবিতে অভিনয়ের জন্যেই, শুধু আলাদা করে রবীন্দ্রনাথের ছবি কেন? যেমন উনি জানালেন চারুলতায় অভিনয়ের সময় ওঁকে ভালো করে সেলাইয়ের কাজ শিখতে হয়েছিল যাতে ছবিতে চারু যেখানে সেলাই করছে সে দৃশ্যে কোন জড়তা না থাকে। সেই সেলাইয়ের প্রয়োজন আবার হয়েছিল স্ত্রীর পত্র ছবির সময়, কিন্তু তখন আর তা অভ্যাস করতে হয়নি। ঐ সময় নতুন করে শিখতে হয়েছিল এসরাজ বাজানো। এইভাবে চরিত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী ছবির শিল্পীদের অনেক কিছু শিখে নেবার প্রয়োজন ঘটে। আর কোন একটি চরিত্রে রূপ দেবার সময় অন্য সমস্ত চিন্তাকে মন থেকে সরিয়ে ফেলতে হয়—এ অভ্যাসও থাকা দরকার।

চারুলতা, মৃণাল না নীরজা—কোন চরিত্রটি ওঁর নিজের কাছে সবথেকে প্রিয়, এ প্রশ্নের উত্তরে সামান্য চিন্তা করে মাধবী দেবী বললেন, 'এভাবে তো ভাবি না, তাই বলতেও পারবো না। সব চরিত্রই আমার কাছে সমান প্রিয়। তবে এখনো পর্যন্ত আমার শেষ কাজ মালঞ্চ ছবিতে, তাই নীরজার চরিত্র এখন আমার মনের খুব কাছাকাছি রয়েছে।' ★



'মালঞ্চ'র সেটে—পূর্ণেন্দু পত্রী ও মাধবী/ পুলক পত্রী

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বর্তমানে কি হাল

সুমিত মজুমদার

দুপুর হলেই গলির মোড়ে শব্দ হত ঠং ঠং : 'বাসন চাই, বাসন!' শব্দ চলে যেত দূরে। তার পরে 'চুড়ি চাই, খেলনা চাই।' তারও পর বেলা পড়ে এলে গরমের দিনে বরফওয়ালা হেঁকে যায় : 'বরিফ চাই, বরিফ, কুলপি বরিফ!' সন্ধেবেলায় 'বেলফুল চাই বেলফুল'-এর প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ত গলির এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেই ফেললেন একটা গান :

'বরিফ বরিফ' বলে
বরফওয়ালা যান।
গা ঢালো রে, নিশি আগুয়ান।'

আজ সংকীর্ণ গলির প্রবেশ মুখে দেবস্থান। পুণ্য গঙ্গাবারি পথ ভিজোয়। বাসি ফুলের মালা যায় গড়াগড়ি। আর দু'পা এগিয়ে ঠাকুরবাড়ির প্রবেশপথের একটু আগে শীতের দুপুরে ফুটপাথে অবাঙালি মহিলারা বসে রোদ পোহান। বেলফুল, চুড়ি, বরিফ-কুলপির দল এ গলিতে আর ঢোকে না। তার বদলে আলুকাবলিওয়ালারা ঠাকুরবাড়ির অঙ্গনে চাটসহ আলুকাবলি বিক্রি করে। আসে ঝালমুড়িওয়ালা। লক্ষ্য তাদের বাণিজ্য। ওদের ঘিরে ভিড় করে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।

৬ নম্বর বাড়ি মহোৎসবে সাজত। ৫ নম্বর দোল উৎসবে। ফুলে ফুলে ফুলময়। সেই সঙ্গে আতরের গন্ধ। নানা রঙে রাঙিয়ে যেত ঠাকুরবাড়ির আঙিনা।

আজও ঠাকুরবাড়ির আঙিনা কখনো শিল্পীর তুলিতে কখনো পোস্টারে উদ্ভাসিত হয়। রাজনৈতিক দলের বিজ্ঞাপন থেকে দাবির বিষয়গুলি সংগীত ভবনের দেওয়ালে, রবীন্দ্রমঞ্চের উপরিভাগে শোভা পায়। সান্ত্বনা এই যে, সেদিন সংগীতভবনের স্থানে ছিল গোলাবাড়ি আর রবীন্দ্রমঞ্চের জায়গা জুড়ে ছিল ঠাকুরবাড়ির উদ্যান।





জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। নীলমণি ঠাকুরের আমল থেকে ঠাকুরবাড়ির সূত্রপাত

১৭৮৪ সালে আজকের মহর্ষি ভবনের একটি অংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ঠাকুর বাড়ির কথা বলতে স্মরণ করতে হবে জগন্নাথ কুশারীকে—ঠাকুরগোষ্ঠীর যিনি আদি পুরুষ। বিবাহের ফলে তিনি পীরালি সমাজভুক্ত হন। জগন্নাথের দ্বিতীয় পুত্র পুরুষোত্তম হতেই ঠাকুর বংশের ধারার সূত্রপাত।

পুরুষোত্তমের উত্তরপুরুষ পঞ্চানন কুশারী। ইংরেজ ক্যাপ্টেনদের জাহাজে মালপত্র উঠানো নামানোর কাজে লাগলেন তিনি। কাজ ছিল শ্রমসাধ্য। সহযোগী ছিলেন তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা। পঞ্চানন কুশারীকে এরাই সম্বোধন করতেন : ঠাকুরমশাই।

ঠাকুরমশায় থেকে Tagore, Tagoure।

পঞ্চানন ঠাকুরের পুত্র জয়রাম। জয়রামের মৃত্যু হয় ১৭৫৬ সালে। ওয়ারিশগণ ধন-সায়রের সম্পত্তি বিক্রি করে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পেলেন। ১৭৫৭ সালে নগর ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ দিলেন মীরজাফর, তিনি তখন বাংলার মসনদে। ড্রেক সাহেব ঠাকুর-পরিবারকে পাইয়ে দিলেন ছ' হাজার টাকা! জয়রামের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ছিল দু হাজার টাকা।

১৭৬৪। পাথুরিয়াঘাটায় গৃহ স্থাপিত হল। তেরো হাজার টাকায় কোম্পানির কাগজ কিনে গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউ-এর নামে দেবত্র করে দেওয়া হল। টাকার সুদে দেবপূজাদি চলতে থাকে। জয়রাম ঠাকুরের দুই পুত্র দর্পনারায়ণ ও নীলমণি দেওয়ানি করে বিত্তবান হলেন। সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলেন 'বাবু' নামে।

প্রথমে মনান্তর, পরে মতান্তর। কথিত আছে, এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে নীলমণি পাথুরিয়াঘাটার গৃহ ত্যাগ করেন। ঠাকুর বাড়ি দুই শাখাতে ছড়িয়ে পড়ল। দুই শাখার বংশধরগণ পরিচিত হলেন বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের অন্যতম হোতা রূপে। দর্পনারায়ণের পৌত্র হরকুমারের পুত্র রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের নাম সংগীতরসিকদের কাছে পরিচিত। তার পুত্র প্রমোদকুমার ঠাকুরের বিলিতি স্বরলিপিতে লিখিত ও বিলিতি স্বরসঙ্গতিযুক্ত দেশী রাগ রাগিণী নিয়ে ছোট ছোট গৎ এর পরীক্ষা নিরীক্ষার কথাও অনেকে মনে রেখেছেন।

১৭৮৪। জুন মাসে বৈষ্ণবচরণ শেঠ প্রদত্ত এক বিঘা জমিতেই জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির পত্তন। নীলমণির পৌত্র দ্বারকানাথের আমলেই এই বাড়ির অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় হয়। নাটোরের জমিদার ধর্মপ্রবণ রাজা রামকৃষ্ণ রায়ের ঔদাসীন্যে উত্তরবঙ্গের জমিদারি যখন নিলাম হল, দ্বারকানাথ সেই জমিদারি কিনে নিতে দ্বিধা করেননি। সেই সঙ্গে ছিল রানীগঞ্জের কয়লাখনি। রামনগরের চিনির কারখানা। ইতিমধ্যে ১৮২৯ খৃস্টাব্দে দ্বারকানাথ চব্বিশ পরগনার কালেকটর ও নিমক মহলের অধ্যক্ষ মিঃ প্লাউডেন এর দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছেন। ১৮৩৪ জুলাই সরকারি চাকরি ত্যাগ করে দ্বারকানাথ কার-ঠাকুর কোম্পানি নামক হৌস প্রতিষ্ঠা করলেন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ছাড়াও বেল-গাছিয়ার ছিল দ্বারকানাথের বাগানবাড়ি। বেলগাছিয়া ভিলায় তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য প্রায়ই ইংরেজ পুরুষদের নিমন্ত্রণ করতেন। বেলগাছিয়া ভিলার অনুষ্ঠানে সাহেবরা নিমন্ত্রিত না হতে পারলে মর্যাদার হানি হয়েছে বলেই মনে করতেন। দ্বারকা-নাথ তখন স্বরাজ্যে সম্রাট।

১৮৪২। দ্বারকানাথের প্রথম বিলাত ভ্রমণ। একদা বিশিষ্ট বৈষ্ণব দ্বারকানাথ গৃহস্থ

'ব্রাহ্মণের ন্যায় স্বহস্তে গৃহদেবতা ৺লক্ষ্মী-জনার্দন শিলার নিত্যপূজা করিতেন।' ইংরেজদের সঙ্গে একাসনে খানা-পিনা করা দ্বারকানাথ মূলভবনের একাংশে ম্যাকিংটশ বার্ণ কোম্পানির সাহায্যে সুবিশাল বৈঠকখানা বাড়ি নির্মাণ করলেন। প্রথমবার বিলাত ভ্রমণকালে পাথুরিয়াঘাটার জ্ঞাতি-গোষ্ঠির নেতা কানাইলাল ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়া দিলেন 'আর চলিবে না, এইবার আমরা বাধ্য হইয়া তোমাকে ত্যাগ করিব।' বিলাত প্রত্যাবর্তনের পর এই বৈঠকখানায় বাস করতে লাগলেন দ্বারকানাথ।

৫ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের বাড়িই সেই 'বৈঠকখানা বাড়ি'। মূলগৃহের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে এই বাড়ির জন্ম।

পিতার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ পরিবারের সঙ্গে ছয় নম্বর বাড়িতেই থাকতেন। দ্বারকানাথের মেজো ছেলে গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী এই বাড়িতে উঠে এলেন। একই আঙিনায় দুটি সামাজিক ধারা। এক বাড়িতে মাঘোৎসব—অন্যবাড়িতে দোলযাত্রা। এ বাড়িতে সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা, ও বাড়িতে রামায়ণের কথকতা।

পরবর্তীকালে পাঁচ নম্বর বাড়িতে বারবার অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। জমিদারির আয়ের অস্থিরতায় বিব্রত গিরীন্দ্রনাথের পৌত্র গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্র সমরেন্দ্র। তাদের পৈতৃক বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কলকাতায় হুহু করে জমির দাম বাড়তে থাকে। তখনই ওরা হিসাব করেছেন জোড়াসাঁকো বাড়ির দাম 'এত' লাখ টাকা হবে। কিন্তু সে সময় বাড়ি বিক্রি করা যায়নি। হয়তো পুরনোর প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণে। মহাকালের অমোঘ নিয়মে বাসিন্দাদের ছাড়তে হল এই বাড়ি। সব বন্ধন ছিঁড়ে গেল ১৯৪১ সালে। কিছুদিন বিদেশী সৈন্যেরা এই বাড়িতে আস্তানা গাড়ল। সরকারি গুদাম রূপেও এবাড়ি ব্যবহৃত হয়। অবশেষে একদিন আবিষ্কৃত হল, এ বাড়ির মালিক ভারতীয় (Bhartiya) কোম্পানি।

আজকের পাঁচ নম্বরের যে অংশটুকু বিদ্যমান, বৈঠকখানা বাড়ির সঙ্গে পরে তা যুক্ত হয়। বিচিত্রা, মহর্ষিভবনে তখন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের কার্যালয়। সজনীকান্ত দাস একদিন কর্মোপলক্ষে এলেন ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়। দেখলেন ৫ নম্বরের গায়ে নির্মমভাবে নেমে আসছে কারিগরদের হাতুড়ি—বাড়ি ভাঙবার হাতিয়ার সমূহ। তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, জানালেন, লুপ্ত হয়ে গেল দক্ষিণের বারান্দা।

সবুজ গালচে বিছানো রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ। শীতে শরীর গরম করতে সেখানে দেখতে পাওয়া যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের, কাজের ফাঁকে। এই মাঠই ছাত্র-ছাত্রীদের অবসর সময়ের বিশ্রামস্থান। জনপ্রিয় শিল্পীদের গান শুনতে, আবার প্রাণের তাগিদেও অনেকে জমায়েত হন পঁচিশে বৈশাখের সকালে ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়। কিন্তু কজন স্মরণ করেন এইখানেই ছিল সেই বৈঠকখানা বাড়ি, ভারতীয় চিত্রকলার পুরোধা-পুরুষ অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথের কর্মভূমি দক্ষিণের বারান্দা—ভারত তথা বহির্ভারতের একদা পুণ্য শিল্পতীর্থ।

ঠাকুরবাড়ির মানুষ-জনের মধ্যে বৈচিত্র্য-পিপাসা সর্বাধিক—সর্বক্ষেত্রে—এমন কি, বাসস্থানের ক্ষেত্রেও এই মন্তব্য করা যেতে পারে। সাহেবী মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে থাকেননি, থেকেছেন বির্জিতলার বাড়িতে। সেনট পলস ক্যাথিড্রাল সংলগ্ন বিরাট পুকুরের পাশে যেখানে প্রেসিডেন্সি হাসপাতাল—বিজনি রাজার পুরনো বাড়ি ছিল সেখানে। সত্যেন্দ্রনাথ সেই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথও পার্ক স্ট্রীটের কাছাকাছি একটি গৃহ ভাড়া নিয়েছিলেন; দ্বিজেন্দ্রনাথও কিছুকাল সেখানে ছিলেন। বাড়ির মালিকের সঙ্গে বিরোধের ফলে আবার ফিরে এলেন জোড়াসাঁকোয়। ঠাকুরবাড়ির সর্বাধিক বিপর্যয় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। যদিও এই বিপর্যয় রবীন্দ্র-মৃত্যুজনিত কারণে নয়, সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক ব্যাপারে।

১৯৪১ সালে ৫ নম্বরের বাসিন্দারা ঘর ছাড়লেন। রঙ-তুলির জায়গা নিল সামরিক অস্ত্র। এমন কি, খাদ্যশস্যের ভাণ্ডারের জন্য দ্বারকানাথের বৈঠকখানাকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে। এই হয়তো নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস।

• ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গঠিত হয়েছে টেগোর মেমোরিয়াল কমিটি—কবির স্মৃতিরক্ষার্থে। তেজবাহাদুর সপ্রুকে পুরোধা করে সুরেশচন্দ্র মজুমদার জনসাধারণের কাছ থেকে প্রায় পনেরো লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। ইতিমধ্যে অপরের হস্তগত হয়েছে শিল্পীদের শিল্পপুরী। শিল্প গড়ার কারিগর, দক্ষিণের বারান্দা বাড়ি ভাঙার কারিগরের হাতে মাটির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সুরেশচন্দ্র সংগৃহীত অর্থে ৫ নম্বর বাড়ির একটি অংশ এবং বিশ্বভারতী ও রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রাপ্য মিটিয়ে দেন। অতঃপর রবীন্দ্রভারতী সমিতি গঠন করে ঐ জমিতে একটি স্মৃতিভবন নির্মাণের কাজে হাত দিয়ে খুবই অর্থের টানাটানিতে পড়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শরণাপন্ন হন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও রবীন্দ্রভারতী সমিতির মধ্যে এই মর্মে চুক্তি হয় যে সরকার কর্তৃক দেয় অর্থে নৃত্য-নাট্য-সংগীত বিদ্যালয় (Academy of Dance Drama & Music) গঠন এবং উদবৃত্ত অর্থ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে ব্যয় হবে

১৫ জানুয়ারি ১৯৪৭ রবীন্দ্র-ভারতী সমিতি স্থাপিত হল। সভাপতি: তেজবাহাদুর সপ্রু। সহ-সভাপতি সুধীরঞ্জন দাস। পরিচালক: রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ: সুরেশচন্দ্র মজুমদার।

১৯৫২ সালে রথীন্দ্রমঞ্চের কাজ আরম্ভ হয়। সমাধা হয় ১৯৫৫ সালে। বেঙ্গল বিলডার্স এই প্রেক্ষাগৃহ তৈরি করেন। খরচ হয় ৩,৫৯,০০০। সুরেন্দ্রনাথ কর নাকি এই প্রেক্ষাগৃহের প্রাথমিক নকশা করেন।

বর্তমানে ৫ নম্বর বাড়ির তিনতলায় সমিতির কার্যালয়। বাংলার বরেণ্য শিল্পীদের সর্বাধিক ছবির সংগ্রহশালা (রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন) রবীন্দ্র ভারতী। সমিতিকে ঘিরে নানা কথাবার্তা। অনেকে অভিযোগ করেন, বর্তমানে যে ছবিগুলি সমিতির সম্পত্তি, সেগুলির সঠিক সংরক্ষণ হচ্ছে না। আজ এ বাড়ির একতলা ও দোতলায় বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্যের ক্লাস হয়। একতলায়—উপরে উঠবার সিঁড়ির কাছে ছোট গ্যারাজে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত মোটর গাড়ি।

১৮ মে ১৯৫৬। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১০৬০ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় সংগীতভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। ১৯৫৬ সালেই জন্ম নিল অ্যাকাডেমি অফ ডানস ড্রামা মিউজিক অ্যানড ফাইন আর্টস। পি এস মাথুর এলেন পরিচালক হয়ে। নাটক নৃত্য ও সংগীতের প্রধান হিসাবে যুক্ত হলেন যথাক্রমে অহীন্দ্র চৌধুরী, উদয়শংকর ও রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫ নম্বর বাড়িতেই প্রথম শিক্ষাদান শুরু। কর্মসচিব হিসাবে যোগদান করলেন বৈদ্যনাথ সরকার। তিন বছরের ডিপলোমা কোরস। প্রতি শাখাতে কুড়িজন করে ছাত্রছাত্রী। তৎকালীন যুব উৎসবের প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমির বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য: সংগীতভবনেও রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মঞ্চ।

৮ মে ১৯৬১। ২৫ বৈশাখ ১০৬৮ রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিক উৎসব। এই শুভদিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু রবীন্দ্রভারতীর শিলান্যাস অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। ১৯৬১ সালে প্রদর্শশালার উদ্বোধন। ১৯৬২ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রারম্ভ। তৎকালে রবীন্দ্রভারতী সমিতির সভাপতি ছিলেন বিধানচন্দ্র রায় ও সম্পাদক বিমলচন্দ্র সিংহ। বস্তুত এঁদের উদ্যোগেই এই পরিকল্পনা।

পরিকল্পনা নিয়মানুগ করতে তৎকালীন—

শিক্ষাধিকারী (Education Secretary) ডি এম সেন ড্রাফট প্রস্তুত করলেন। বিধান সভায় সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য হল। অ্যাকাডেমির আচার্য ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হলেন রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু। উন্নয়ন বিভাগের কমিশনার হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব নিলেন উপাচার্যরূপে। যে একবিঘা জমির উপর ঠাকুরবাড়ির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের কালে সেই জমির পরিমাণ দশ বিঘা বারো কাঠার মতন। শুধু এই অঞ্চলে ঠাকুরবাড়ির কোন বংশধর বাস করেন না, শোভা পায় ঠাকুরবংশের বংশধরদের প্রতিকৃতি।

মহর্ষিভবনের পাশের লাল বাড়ি বিচিত্রা। দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র নীতীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে এই বাড়ির কাজ শেষ হয়। শোনা যায় দোতলা উঠে যাবার পর সকলের খেয়াল হয় যে সিঁড়ির কোন ব্যবস্থাই হয়নি —ফলে পূর্বদিকে দরজা করে কাঠের সরু সিঁড়ি তৈরি করা হল শেষ পর্যন্ত। এই সঙ্গেই বিচিত্রা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা—ঠাকুরবাড়ির আর এক স্মরণীয় অধ্যায়। প্রথম দিনে সভাপতি ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। শিল্পী নন্দলাল এঁকেছিলেন প্রতীকচিহ্ন। কার্যক্রম ছিল বিচিত্র। সন্ধ্যায় সাহিত্যের আসর। অন্যদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছেন তাঁর বহু নতুন রচনা। সকালবেলায় ক্লাব রূপান্তরিত হত কলাভবনে। হাজির থাকতেন নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ কর, মুকুল দে, নারায়ণ কাশীনাথ দেবল প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। একই সঙ্গে কাউন্ট কাইজারলিঙ, রোটেনস্টাইন, পাঞ্জলোজো, ওকাকুরা, আনন্দকুমারস্বামী, লরড কারমাইকেল প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক, শিল্প সমালোচক, শিল্প রসিকরা এই গৃহে পদার্পণ করেছেন। এই বিচিত্রার দোতলার হলঘরে বিখ্যাত 'ডাকঘর' অভিনয় হয়েছিল যার দর্শক রূপে উপস্থিত ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ মহামান্যগণ। এই গৃহ বাংলার সংস্কৃতিকে দিয়েছে অনেক। এই গৃহ মানুষ রবীন্দ্রনাথের নিয়েছে অনেক। দোতলার উত্তর-পূর্ব দিকের ঘরে ২৩ নভেম্বর ১৯০২ সালে পত্নী মৃণালিনী দেবীর ও তিনতলার ঘরে ১৩ বছর বয়সে কন্যা রেণুকার মৃত্যুর সাক্ষী 'বিচিত্রা'। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের কার্যালয় ছিল দোতলায়, একতলায় ভাণ্ডার।

১৯৬৫। সংগীত-নাটক অ্যাকাডেমি তাদের যাত্রা আরম্ভ করলেন। কেন্দ্রীয় অ্যাকাডেমির প্রতিনিধিস্বরূপ কাজ করলেও অ্যাকাডেমি রাজ্য সরকারের সঙ্গে যুক্ত। সংগীত-নাটক ও সমকালীন চিত্রের প্রতিযোগিতা ছিল নানান কাজে ব্রতী এই অ্যাকাডেমি। সংগীতের প্রতিযোগিতা ১৯৭৬ সালে বন্ধ হয়ে গেলেও সমকালীন চিত্রকলা প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয়। ভালো নাটকের জন্য তিনটি পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতি বৎসর সর্বক্ষেত্রে স্মরণীয় দুই ব্যক্তিকে পাঁচ হাজার টাকা করে সম্মান-পুরস্কারে ভূষিত করেন অ্যাকাডেমি। কেন্দ্রীয় অ্যাকাডেমি পুরস্কারের জন্য এরা নির্দিষ্টজনের নাম নির্বাচিত করেন। বর্তমানে বিচিত্রা ভবনের এক তলায় সমকালীন চিত্রকলার স্থায়ী গ্যালারি করার পরিকল্পনা অদূরকালে কার্যকরী হবে।

মহর্ষিভবনের দক্ষিণ দিকে থাকতেন এক তত্ত্বজ্ঞানী, বেদান্ত ছিল তাঁর মনের খোরাক। দর্শনের তুলনামূলক প্রবন্ধ তিনি লিখতেন। আবার তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' পড়ে চমকে উঠেছিলেন মাইকেল মধুসূদন। সেই অসাধারণ মানুষ দ্বিজেন্দ্রনাথ থাকতেন এই অংশে। পরবর্তী কালে সুধীন্দ্রনাথ, সৌমেন্দ্রনাথের এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের বংশধর অজীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঠিকানা। ৫ নম্বর বাড়ি বিক্রির পর সৌমেন্দ্রনাথের বাড়ির (অংশ) নীচের তলার দুখানা ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন সমরেন্দ্রনাথের পৌত্র সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্মরণ করা যেতে পারে একদা সৌমেন্দ্রনাথের



বামপন্থী রাজনীতিকে ঠাকুরবাড়ির অনেকেই প্রসন্নভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। সেদিন ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় দেখা দিল গোবিন্দ মিলের কোরমান, চট্টগ্রামের জাহাজী বাদিমুদ্দীন, মেছুয়াবাজারের বদিরুদ্দিন দল, আসত ঠাকুরবাড়ির আখড়ায় : 'লেনিন' সৌমেন্দ্রনাথের কাছে। এইদিকের একতলায় একটি ঘর ছিল দেবেন্দ্রনাথের ষষ্ঠ পুত্র সোমেন্দ্রনাথের।

আমূল পরিবর্তন হয়েছে দক্ষিণাঞ্চলে। এখানে হচ্ছে স্থায়ী গ্যালারি। রবীন্দ্রনাথ-ব্রিটিশ পেনটার্স ও অবনীন্দ্র শৈলীর ধারার ছবিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই প্রদর্শশালা। ইউ জি সি প্রদত্ত ৮০ হাজার টাকায় সংগ্রহ করা হয়েছে অবনীন্দ্রনাথের কিছু চিত্র। ১৯৬১ সালে মাত্র ১৫টি ছবি নিয়ে যে প্রদর্শশালার উদবোধন, ১৯৮০ তার সংখ্যা ১০০০, যার শতকরা ৯৫ ভাগই পাওয়া গিয়েছে দান হিসেবে।

মহর্ষিভবনের তিনতলাতেই থাকতেন রবীন্দ্রনাথের নতুন বউঠান। থাকতেন বাংলা সংস্কৃতির চিরকালীন ব্যক্তিত্ব জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—কিশোর রবীন্দ্র-প্রতিভা উন্মেষে যাঁর ভূমিকা সর্বাধিক। বউঠান কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাঁচিতে স্বেচ্ছা নির্বাসন। ঠাকুরবাড়ির আঙিনাতে বেদনাজনক ঘটনা। তিনতলার কাচের ঘরে এখন আর হরিণ বিচরণ করে না। তিনতলা এখন স্থায়ী প্রদর্শন কক্ষ। ঠাকুরবাড়ির কথা, ঊনবিংশ শতাব্দীর স্মরণীয় ব্যক্তিদের ইতিহাস জানতে সাধারণ মানুষের ভিড় হয়।

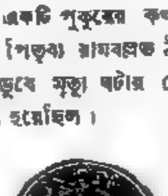
ঠাকুরবাড়ির পুরনো দিকটা—মহর্ষিভবনের পিছনের অংশ ছিল হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। পরবর্তীকালে ক্ষিতীন্দ্রনাথের। হেমেন্দ্রনাথের বিরাট সংসার। তাঁর মাতৃভক্তি ছিল স্মরণীয়। বিশেষ কারণে দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে কিছু অর্থ দিয়েছিলেন; সেই টাকাতেই হেমেন্দ্রনাথ বর্তমান মহর্ষিভবনের পশ্চাতে নতুন বাড়ির কাজে হাত দেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ সে কাজ সমাধা করেন। এককালে আর্থিক কারণে এই অংশের অনেক ঘর ভাড়া দেওয়া হয়। শোনা যায় বিক্রিও করে দেওয়া হয়। বর্তমানে এই অংশ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস।

সময় বড়ো নিষ্ঠুর। যে পরিবারের মানুষেরা বাংলার নবজাগরণের অন্যতম হোতা—আজ তাঁদের বংশধররা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন। সরকারী অধিগ্রহণকালে এঁদের মধ্যে অনেকেরই আর্থিক ক্ষতি হয়তো পূরণ হয়েছে। কিন্তু যাঁরা প্রবীণ তাঁরা কি ভুলতে পারেন পুরনো সেই দিনের কথা।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উৎসব। ভিক্টোরিয়ার পরিবারের লোকসংখ্যা প্রায় একশো। ঠাকুরবাড়িতে বড়োদের মধ্যে লেগে গেল তর্ক—কার পরিবার বড়ো। খগেন্দ্রনাথ খাতাখুলতি করে 'মহা উল্লাসে জানালেন মহর্ষি-পরিবারের শতাধিক আত্মীয়-স্বজন একখানা বাড়িতেই বাস করছেন। 'মহর্ষির কাছে ভিক্টোরিয়া হেরে গেলেন।'

আজ মহর্ষি-পরিবারের লোকেরা স্মৃতি-চারণ করতে আসেন মহর্ষিভবনে। একতলায় সুবৃহৎ দালান—যেখানে রবীন্দ্রনাথ ফাল্গুনী অভিনয় করেছিলেন, সেই আবেগ-মথিত স্মৃতিচিত্রণ করতে গিয়ে দোতলার বারান্দায় থেমে যেতে হয় বক্তাকে। তখন নীচে সেই দালানেই চলছে ব্যাডমিন্টন খেলা। বার বার অনুরোধ জানাতে হয় অনুষ্ঠান-পরিচালককে, বলতে হয়, বড়ো অসুবিধে হচ্ছে। অবশেষে খেলা থামে। রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ আবার আভিনয় শুরু করেন।

সময় বড়ো পরিবর্তনশীল। ঠাকুরবাড়ির জন্মলগ্নে এই অঞ্চলের নাম জোড়াসাঁকো ছিল না। মেছুয়াবাজার নামেই পরিচিত ছিল। সেদিন অসংখ্য মাটির ঘর ছিল—বাড়ির সামনের ও পিছনের অংশে। ঠাকুরবাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে ছিল গোকুল দত্ত শিবকৃষ্ণ দত্তদের জমি। মাটির বাড়ি ভেঙে উঠল পাকাবাড়ি চার ধারে। বিদায় নিল মাটির ঘরে প্রদীপ জ্বালানো সেদিনের অনেক নিশিকন্যা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েই আবার পরিবর্তনের ঢেউ। মোটা টাকার বিনিময়ে অনেক বাঙালি পরিবার ঘরবাড়ি বিক্রি করেন, চলে যায় অবাঙালীদের হাতে। ঠাকুরবাড়ির আরো একটু দক্ষিণে বিখ্যাত রাজেন মল্লিকের বাড়ি। যে বাড়ির প্রসিদ্ধি 'মার্বেল প্যালেস' নামে। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে যোগ যাঁদের দীর্ঘকালের। শুধু দ্বারকানাথ ঠাকুর গলিতে ঢোকবার মুখে ডাইনে কায়েদের সেড়শো বছরের পুরনো বাড়ি এখনো বিদ্যমান। হারিয়ে গেছে আরো একটু দক্ষিণে আদি ব্রাহ্মসমাজের বাড়ি, যার বর্তমান ঠিকানা ৫৫ নম্বর রবীন্দ্রসরণী। হেমেন্দ্রনাথের বাড়ির দিকে, ঠাকুরবাড়ির পিছনে—সি আই টি-র একাধিক বাড়ি। পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে ঠাকুরবাড়িতে। বাহির বাড়ির পূর্ব কোণে ছিল চাকরদের মহল। সেই ঘরের জানলার নীচে ছিল ঘাট-বাঁধানো পুকুর। পুকুরের ধারে কুঠরীতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম অধিবেশন হয়। কথিত আছে দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র বুধেন্দ্রনাথের এই পুকুরে ডুবে মৃত্যু হওয়ায় পুকুরটি বুজিয়ে ফেলা হয়। বাড়ির ভিতরে আর একটি পুকুরের কথা জানা যায়। দ্বারকানাথের পিতৃব্য রামবল্লভ ঠাকুরের পুত্রের এই পুকুরে ডুবে মৃত্যু ঘটায় সেই পুকুরটিও বুজিয়ে ফেলা হয়েছিল।



১৯৭৬। দক্ষিণের ফাঁকা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রশাসন দফতর, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নবতম গৃহ। অফিস ও লাইব্রেরির জন্য নির্দিষ্ট। এই জায়গায় একটি আচ্ছাদিত মঞ্চে মহর্ষির একটি উপবিষ্ট শ্বেতমর্মর মূর্তি দেখা যেত। তার হদিশ জানতে ইচ্ছা হয়।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি আয়তনে বিরাট। বয়সেও নবীন নয়। ২৩ নভেম্বর ১৯৭৭। যুগান্তর পত্রিকায় একটি সংবাদ সকলকে চিন্তিত করে তুলল। সেদিন সংবাদপত্রে বড়ো হরফে প্রকাশিত হল :

ঠাকুরবাড়ির বহু সম্পদ বাঁচানো দায়

"জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, শশী হেস, উইলিয়াম বিচি, ব্যারন ভি ভি সুইটাম, চিত্রেরির আঁকা বহু ছবি, বহু ঐতিহাসিক দলিল, রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের নানা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ নিয়ে দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। তার কারণ ঠাকুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালার 'বিচিত্রা' এবং 'মহর্ষিভবনের' অনেকাংশ উপযুক্ত মেরামতের অভাবে বর্তমানে গুরুতর সংকটের সম্মুখীন—।"

প্রদর্শশালার অধ্যক্ষ মারফত এ সংবাদ যেদিন ছড়িয়ে পড়ল, সেদিন অনুভব করলেন বাংলার মানুষ—জোড়াসাঁকোর এই বাড়ির সঙ্গে তাদের বন্ধন অচ্ছেদ্য। এই বিষয়টি সর্বত্রই গুরুত্বলাভ করল তবে কি সত্যিই মহর্ষিভবন বিপজ্জনক! ইতিপূর্বে ১৯৬১, ১৯৬৪, ১৯৭২ ও ১৯৭৬ মহর্ষিভবন মেরামত হয়েছে। ধরা যেতে পারে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর তিন লাখ টাকা পাওয়া যেত। কিন্তু সে টাকা সিন্ধুতে বিন্দু।

২৪ নভেম্বর স্বয়ং উপাচার্য প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সাংবাদিকদের জানালেন, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত এই পুণ্যগৃহ রক্ষার্থে 'দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে আমার লজ্জা নেই।'

অবশেষে রাজ্যসরকার সরকার দায়িত্বভার নিলেন। বিচিত্রার ছাদ ভেঙে নতুন হচ্ছে। ঠাকুরবাড়িকে দেওয়া হচ্ছে নবরূপায়ণ। সেই কারণে বিচিত্রা ও মহর্ষি ভবনের তিনতলার প্রদর্শনী সাময়িক ভাবে বন্ধ। খরচ হবে আনুমানিক বাত্রিশ লক্ষ টাকা। দোতলার কাবকক্ষ খোলা রয়েছে সাধারণের জন্যে।

এ বাড়ির কিছু কিছু অংশে—৫ নম্বরের ও বিচিত্রার পিছনের দিকে বাস করছেন রবীন্দ্রভারতী সমিতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মিবৃন্দ। হেমেন্দ্রনাথের অংশে যারা বসবাস করেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা—তাদের বাড়ি ছাড়বার জন্যে নোটিস দেওয়া হয়েছে। আরো দু-একজন পেয়েছেন। এই অংশেই বিদ্যমান ঠাকুরবাড়ির আঁতুড় ঘর। যেখানে জন্মেছিলেন পরবর্তীকালের



অনেক সনাতনধর্মী মানুষ। ৫ নম্বরের তিন-তলায় চলে যাবে থাকেন রবীন্দ্রভারতী সমিতির ও তিনতলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মী। দোতলার এক পাশে থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক।

আজকের ঠাকুরবাড়ির প্রবেশমুখে শঙ্করের মন্দির। সেখানে দুবেলা আসছেন মহিলারা যাদের অধিকাংশই অবাঙালি। তারই মধ্যে কোন এক মহেশ্বর লালজী অগ্রবালের সন্তান হনুমানজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। কাঁসর ঘন্টার আওয়াজ, শিবের মাথায় ঢালা জল প্রবেশমুখ কর্দমাক্ত করে। পাশে অবাঙালিদের বাড়ি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশমুখে বাঁধা থাকে গৃহপালিত পশু। সামনে রাস্তার কলে চলে স্নানাদি। ঢোকার দক্ষিণ দিকের জমি বিশ্ববিদ্যালয় অধিগ্রহণ করে বাড়ি করেছেন। সেখানে হয়তো থাকবেন অধ্যাপকরা কিংবা হবে ছাত্রী-নিবাস। মদন চ্যাটার্জি লেনেও রয়েছে দেব গৃহ। রবীন্দ্র মঞ্চের অনুষ্ঠান চলাকালীন দর্শক ও শ্রোতারাও সন্ধ্যাতে দেবারতি উপভোগ করেন। যদিও ক্ষীণ কাঁসর ঘন্টার আওয়াজ মন্দির থেকে মঞ্চে ঢুকে পড়ে।

উত্তর দিকের বড়ো তেঁতুলতলায় ছিল ঠাকুরবাড়ির গৃহকার্যের সহযোগিতা করার লোকজন। যেদিন অবনীন্দ্রনাথ বাড়ি ছেড়ে চলেছিলেন, তাঁকে ঘিরে এরা কেঁদে ফেলে ছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন, 'এখন উপায় কি হবে বাবু, আমাদের তুলে দিলে কোথায় যাব?'

এদের অনেকেরই এখানেই জন্ম, এখানেই মৃত্যু। রবীন্দ্রভারতীর কর্মী গোপাল সোনারদের বাস তিনপুরুষ ধরে ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়। গোপালের বাবা কানাইরাম রবীন্দ্রনাথের সেবা করেছেন, ঠাকুরদা মধুসূদনের কথা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, ছড়াতেও।

ব্রজেন্দ্রনাথ দাস ঠাকুরবাড়ির নানা কাজ করতেন, কাঠের কাজও। বিয়ে করলেন বিচিত্রার পিছনের অঙ্গনে কেবলচন্দ্র রায়ের কন্যা বীণাকে, সে বিবাহে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। স্বামীর মৃত্যুর পরে কাজ পেলেন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগে- পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। বীণা দাসী বলেন, 'এ আমার বাপের বাড়ি, ওঁকে বলতাম, তুমি তো ঘরজামাই।'

প্রতিমা দেবীর দেশের লোক ভোলানাথ দাস। তাঁর নাতি শ্যামল দাস আজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক।

ঠাকুরবাড়ির আঙিনা থেকে ঠাকুরবংশের মানুষেরা নিয়েছেন বিদায়। আছেন তাঁদের অনেক আশ্রিতেরা। অবসর সময়ে তাঁরা স্মরণ করেন সেই গৌরবময় দিনগুলি—স্মরণ তাঁদের স্মৃতিকে পীড়িত করে। শুধু মাস-মাইনের মানুষরা কি এভাবে কাঁদতে পারছেন?

আর আছেন রাশিয়ার শিল্পী Aszgoor নির্মিত রবীন্দ্রমূর্তি ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় ১৯৬৫ সাল থেকে - সংগীতভবনের দিকে তাকিয়ে আজ শুধু নীরব দর্শক। বিচিত্রা-মহর্ষিভবন থেকে ৫ নম্বর বাড়ি—সেখান থেকে বিদায় নিয়েছে তাঁর আত্মপ্রিয় গ্রন্থন-বিভাগ। দেখেছেন কিভাবে মদন চ্যাটার্জি লেনের দিকে, ঠাকুরবাড়ির আঙিনার দক্ষিণ দিকে, যেখানে তাঁর দশ বছরের ছোট ভাইপো অবন পাখিদের নিয়ে খেলায় মেতে ছিলেন, সেখানে একে একে দোকানঘর গড়ে উঠেছে বাণিজ্যিক কারণে। যদিও আজও সেইসব দোকান খোলা সম্ভব হয়নি। তাঁর নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিভাগ স্থানান্তরিত হল বরানগরের মরকতকুঞ্জে—তার সাক্ষীও তিনি।

হয়তো পাঁচ নম্বর বাড়ি থেকে অবনীন্দ্রনাথের দীর্ঘনিশ্বাস তাঁর কানে এসে পৌঁছায় 'তেতলার ছাতে জ্যোতিকাকা মহাশয়ের পিয়ানোর সুর, রবিকার গান, জ্যাঠামশায়ের হাসির গমক, কোথায় চলে গেল সে সব।' দ্বারকানাথের তৃতীয় পুরুষ সেই সূর্যপ্রতিম মানুষটি আজ আর তার প্রতিবাদ করেন না। ★

আলোকচিত্র ঃ-অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়



নিবেদিতা চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের বিয়ে

রবীন্দ্রনাথের বিয়ের ভারি সুন্দর বিবরণ লিখেছেন এক প্রত্যক্ষদর্শিনী আত্মীয়া। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির এক মহল থেকে আরেক মহলে গিয়ে কবি বিবাহবাসরে বসেছিলেন। তারিখ ১২৯০ বঙ্গাব্দের ২৪ অগ্রহায়ণ। পাত্রের বয়স বাইশ, পাত্রীর এগারো। বিয়ের বাসরে গানও গেয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ হেমলতা লিখেছেন : ঘরের ছেলে নিতান্ত সাধারণ ঘরোয়া ভাবে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়েছিল। জুতাযোড়ের সম্পর্ক ছিল না, তার মধ্যে পারিবারিক বেনারসী শাল ছিল একখানি—যার যখন বিয়ে হত সেইখানি হত বরসজ্জার উপকরণ। নিজের বাড়ীতেই পশ্চিমের বারান্দা ঘুরে রবীন্দ্রনাথ বিয়ে করতে এলেন অন্দরমহলে—স্ত্রী আচারের সরঞ্জাম যেখানে সাজানো। বরসজ্জার শালখানি গায়ে জড়ানো রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন পিঁড়ির উপর।

বিয়ের সময় কাকীমা ছিলেন খুব বোকা। গ্রামের বালিকা, অতুলে হাবভাব কিছুই জানতেন না। কী মানুষের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হচ্ছে—সে যে কত বড় আশ্চর্য মানুষ কাকে তিনি পেলেন, এর কোন ধারণাই তাঁর ছিল না। এখানে এনে সাতপাক ঘোরানো হল—শেষে বরকনে দালানে চললেন সম্প্রদান হবে। দালানের একধারে বসবার জায়গা ছিল আমাদের। দেখলুম সেখানে বসে বড়কে কাকীমার সম্প্রদান। সম্প্রদানের পর বরকনে এসে বাসরে বসলেন। নির্দিষ্ট ঘরে বাসর বসলো। বাসরে বসেই রবীন্দ্রনাথ দুষ্টুমী আরম্ভ করলেন।

রবীন্দ্রনাথের নিজের বাড়ি—নিজেই বর। তাঁকে শ্বশুর বাড়ি যেতে হয়নি। তাই তাঁর লজ্জা-সঙ্কোচের কারণ ছিল না। বাসরে গান জুড়ে দিলেন : আ মরি লাবণ্যময়ী/কে ও স্থির সৌদামিনী/পূর্ণিমা জোছনা দিয়ে/মার্জিত বদনখানি।...

দুষ্টুমী করে গাইতে লাগলেন কাকীমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। বেচারী কাকীমা রবীন্দ্রনাথের কাণ্ড দেখে জড়োসড়ো।

রবীন্দ্রনাথ কি খেতে ভালবাসতেন

'আপ রুচি খানা' কথাটা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে খুব মানানসই। সামনে অনেকরকম সাজিয়ে দেওয়া হত। খেতেন হয়ত এক চামচ করে। মাঝে দিনকতক হয়ত চললো শুধুই সেদ্ধ, আবার দিনকতক শুধুই তেতো। মাসের'পরমাস নিরামিষ খেতে। বাংলার কোন অঞ্চলে কোন রান্না বিখ্যাত খবর রাখতেন। শান্তিনিকেতনের এক কর্মীর স্ত্রী যশোরের মেয়ে শুনেই তিনি বললেন, 'ঐ কচু আর বড়ি দিয়ে কৈ মাছের ঝোল রাঁধতে পারো? আর কুলের অম্বল, মুগের ডাল।'

তাঁর খাওয়ার খুঁতখুঁতানি ছিল খুব মজার। হয়ত গোড়াতেই খেলেন খানিকটা পায়েস, তারপর খেলেন কয়েকটা আলুভাজা, নয়ত একটু মোচার ঘন্ট—তারপর হয়ত দুটি দই-ভাত আর সবশেষে দু'খানা লুচি ও একটু ঝোল।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকদের বাড়ি থেকে নানারকম রান্না আসতো তাঁর মধ্যাহ্ন ভোজে। একবার সুধীর করের মা পাঠালেন সুক্তো, ঝিঙে-পাতুরি, মাছের মুড়োর ডাল, কচি আমের পাতলা ঝোল, মাছের ঝোল, পাটিসাপটা। মমতা দেবী একবার পাঠালেন চিঁড়ে ভাজা। সবই আনন্দ করে খেলেন। রান্নার ব্যাপারে নতুন পরীক্ষাও চালাতেন কবি। এক সময়ে কমলালেবুর আচার রান্না খেতেন খুব। মাছের মুড়ি ও লুচিতে কালজিরের অন্তর্গত মরিচ দেওয়া হত।

কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর রান্নার হাত ছিল চমৎকার। কবির জন্যে তিনি অনেক যত্নে নিজের হাতে বানাতেন চিঁড়ের পুলি, দইয়ের মালপো, পাকা আমের মিঠাই ও অনেক রকম মিষ্টি। বিয়ের পর নতুন সংসার পেতে কবিপত্নী যখন রান্না করতেন কবি তখন রান্নাঘরে মোড়া পেতে বসে নানারকম টিপস দিতেন তাঁকে।

মৃণালিনীর অকালমৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ বহু বছর নিরামিষভোজী ছিলেন। কোন কোন সময় অন্ন ত্যাগ করে ফোলা-ভেজানো মুগ-ভেজানো খেয়ে দিন কাটাতেন। সত্তরোর্ধ্ব বয়সে খাবার সময় গৃহিণী বিহীন সংসারে ওটমিল, দুধ, ফল ও কাঁচা সবজি ছাড়া কিছু খেতেন না। ঘরের তৈরি স্ত্রীর হাতের অমুকরকম মিষ্টি খেতে অভ্যস্ত রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী-বিয়োগের পর একবার বললেন গভীর অভিমানে, 'ঘরের মিষ্টি আর আমার দরকার নেই।'

রবীন্দ্রনাথ কেমন পোশাক পরতেন

সাধারণত কবি পাজামা ও ঢিলে জামা পরতেন, উৎসব উপলক্ষে পরতেন ধুতি, চাদর, শেরওয়ানি আর বিদেশভ্রমণে মাথায় উঁচু টুপি ছিল বিখ্যাত। গোলাপ ফুলের মত গায়ের রঙ ছিল, উচ্চতা ছিল ছ'ফুটের বেশি। সব পোশাকেই মানাতো।

পোশাককে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'দেহ মনের তান'। খেয়াল রাখতেন তান যেন গানকে না ছাপিয়ে যায় অর্থাৎ পোশাক যেন দেহকে ছাড়িয়ে 'আমায় দেখো' না বলে। তাঁর আলখাল্লা আর পাজামা পরার অভ্যাসকে অনেকে মনে করতেন নেহাতই কবির খেয়াল। অনেকে আবার ব্যঙ্গ করে বলতেন 'বিজাতীয়'। কবি বলতেন, ঠাকুর পরিবার একদা নবাব সরকারে প্রভাবশালী ছিলেন, তারই সৌজন্যে মোগলাই সাজসজ্জা ও আদব-কায়দা তাঁদের ঘরে ঢুকে পড়ে। তবে সাহেবী পোশাকে ছিল তাঁর ঘোর অরুচি।

ধুতি চাদরে তাঁকে চমৎকার মানাতো। একবার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী তাঁকে ধুতি না-পরার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'তোমরা তো আমাকে ঐরকম বাড়িয়ে বলো। ধুতি পরবো কি? কত ল্যাটা—কে কোঁচান, কে পাট করে। ঐ সব দুঃখেই তো বালিশের ওয়াড়গুলো পরে থাকি।'

রবীন্দ্রসংগীতের অন্দরমহল

এখন পর্যন্ত পাওয়া রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যা আনুমানিক দু'হাজার দুশো বাহান্নখানি। তারমধ্যে আঠারশো নব্বইটি গানের স্বরলিপি আছে। আরও স্বরলিপির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। মোট ১৪০টি স্বরলিপি হারিয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম গান সম্ভবত 'গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে'। কবি তেরো বছর বয়সে ১৮৭৫ সালে এই গানটি রচনা করেন। গানটি শিখগুরু নানকের একটি ভজনের অনুবাদ। তাঁর প্রথম মৌলিক গান (অর্থাৎ কথা ও সুর দু দিক থেকে): 'নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়' ১৮৭৮ সালের আগে লেখা।

রবীন্দ্রনাথের রচিত শেষ গানটি হল : 'ঐ মহামানব আসে'। তবে 'হে নূতন, দেখা দিক আরবার' তাঁর অতিপ্রসিদ্ধ এই গান সুরযোজনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সবশেষ রচনা। এটির সুর রচনার তারিখ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২৩ বৈশাখ। ঐ বছরেই ২২ শ্রাবণ কবির প্রয়াণ ঘটে।

যেমন প্রশ্ন তেমনই জবাব

একবার একটি ছেলে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিল তিথিতে আমিষ খেলে দোষ হয় কেন? নিরামিষ খেলে ক্ষতি কি?

জবাবে কবি লিখলেন, 'ঘটেই তো! এর গায়ে আঁশ দেখেছি বলে তো মনে হয় না। দিব্যি গোলগাল—খাসা আলুর মতোই তো!'

একজন রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'শুনেছি দাড়ি রাখলে মানুষ দীর্ঘায়ু হয়। আপনি দাড়ি রেখেছেন—সুতরাং এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি জানতে চাই।'

রবীন্দ্রনাথের জবাব : 'দাড়ি রেখেছি এবং দীর্ঘায়ুও হয়েছি—জানি না দুয়ের মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে কিনা। কিন্তু বিপদ এই যে, যারা স্বল্পায়ু হয়, দাড়ি তাদের বাহুল্য অর্জন করতে পারে না। কাজেই উল্টো দিক থেকে প্রস্তাবটির মূল্য যাচাই করার উপায় নেই।'

একজন ভদ্রলোক চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ভূতে বিশ্বাস করেন কিনা। প্রসঙ্গতঃ ভদ্রলোক জানিয়েছিলেন তিনি নিজে ভূতে বিশ্বাসী এমন কি স্বচক্ষে ভূত দেখেছেনও।

প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'বিশ্বাস করি না করি, তার দোহাই দেব না। তাই তৈরি থাকে থাকে। সাহিত্যে পলিটিক্সে সর্বত্রই এক এক সময় ভূতুড়ে দৌরাত্ম্য খুব দেখা যায়। দেখেছিও অনেক—দেখতে শুনতে কিছু ঠিক মানুষেরই মতো।'

নোবেল প্রাইজ পাবার খবর শুনে

রবীন্দ্রনাথ নোবেলপ্রাইজ পান ১৯১৩ সালে। নগদ অর্থমূল্য ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। সে সময়ে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে চলছিল দারুণ অর্থসংকট। স্কুলবাড়ি নির্মাণ ও জলনিকাশের ব্যবস্থা না করলে আশ্রমিকদের স্বাস্থ্যভঙ্গের আশংকা দেখা দিত। আশ্রমের সচিব নেপালচন্দ্র রায় ও রবীন্দ্রনাথ সে সম্পর্কেই আলাপ করছিলেন একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে। দুজনে হাত নেড়ে জল-নিকাশনের কাল্পনিক নর্দমাগুলির প্ল্যান বানাচ্ছিলেন। তা সম্পন্ন করতে লাগবে অনেক লক্ষ টাকা। কিন্তু টাকা কই?

হঠাৎ দেখা গেল ঘর্মাক্তকলেবর হয়ে ছুটে আসছেন সি এফ এন্ড্রুজ। বোলপুর স্টেশন থেকে সরাসরি ছুটে এসে তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে জানালেন, রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, এইমাত্র তারবার্তা এসেছে।

এশিয়ার মধ্যে প্রথম নোবেল প্রাইজ বিজয়ী কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে আশ্রম সচিবকে বললেন, 'এই দেখুন নেপালবাবু, আপনার নর্দমার টাকা এসে গেছে।'

মুখে মুখে ছোটদের গল্প

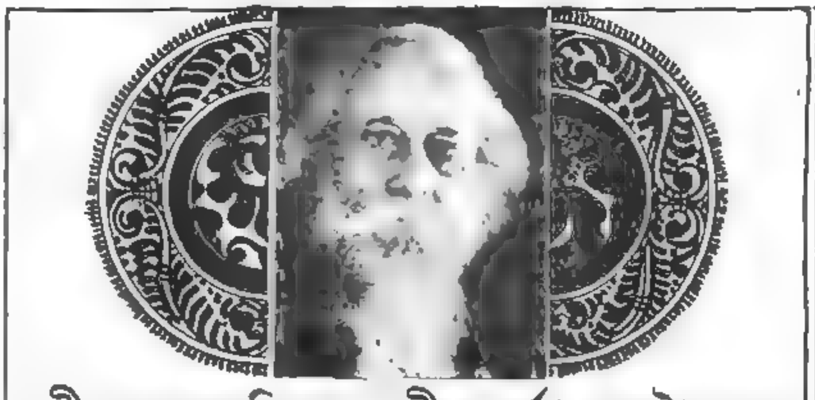
শান্তিনিকেতনে একদিন দুপুরে একটি ছোট মেয়ে ও তার পিছনে একটি ছেলে এসে দাঁড়িয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ঘরের জানলায়। কবি বললেন 'ভেতরে আয়'। গুটি গুটি এলো দুজন। মেয়েটি বললো, 'একটা গল্প বলবেন?' হো হো করে কবি হেসে বললেন, 'এঃ এই কথা। আচ্ছা শোন সেই অতিপ্রাচীন দিনের কথা, যখন বাঘেরা পান খেতো।' 'পান খেতো, সেজে দিতো কে,' প্রশ্ন করলো মেয়েটি। 'সেজে দেবার অভাব কি, মণিকা, স্বর্ণা, শাশ্বা কত মেয়েই তো থাকতো বাঘের গুহায়।' জবাব দিলেন। চোখ বড় বড় করে দুজনে বললো, 'কি সর্বনাশ, খেয়ে ফেলতো বাঘ?' 'খাবে কেন', সঙ্গে সঙ্গে কবির উত্তর, 'একে মহানুভব বাঘ, তাতে পান সেজে দিত যে। কিন্তু এই যে সপ্তাহের বাঘ, এর কি হল জানিস? একদিন পান চিবুতে চিবুতে সে ঘুমিয়ে পড়লো! এদিকে সত্যযুগ শেষ হয়ে কলিযুগ এসে পড়লো। স্বর্ণা, মণিকা, শাশ্বারা যে যার পাখী হয়ে উড়ে চলে গেল আকাশে। পানের বাটাটাও তারা নিয়ে চলে গেল সঙ্গে। তারপর জাগলো সে। জেগেই বলল, পান নিয়ে এসো। কিন্তু কে পান আনবে? মণিকা কর্পূরও নেই পানের বাটাও নেই। রাগে গরগর করতে করতে সে এসে ঢুকলো মানুষের পাড়ায়। তারপর থেকে যাকে পেলো, তাকেই খেয়ে মুখ লাল করতে লাগলো। পান তো খেতে হবে।'

শ্রোতা দুটি খুব খুশী। ছেলেটি খাটো গলায় বললো, 'বুঝেছি, মানুষ হয়ে গেলো।' 'এই তো ঠিক বুঝেছিস', বলেই তাঁকান মন দিলেন কবি।

রবীন্দ্রনাথের তৈরি পরিভাষা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘজীবনের সাহিত্য সাধনা ও আলাপ আলোচনায় বহু ইংরেজি শব্দের পরিভাষা তৈরি করেছিলেন। তার মধ্যে থেকে আমাদের নিত্যব্যবহার্য পরিচিত ও বহু প্রচলিত বেশ কিছু শব্দ এখানে দেখা যাবে। এসব অনুবাদ যে রবীন্দ্রনাথের বানানো তা আমরা কতটুকু জানি?

Aesthetics : নন্দনতত্ত্ব, Aristrocrat : অভিজাত, Background : পটভূমিকা, Calendar : দিনপঞ্জী, Certificate : অভিজ্ঞানপত্র, Chorus : সম্মেলক সংগীত, Controller : নিয়ামক, Corporation : পুরসভা, Culture : সংস্কৃতি, Engaged : বাগদত্তা, Extremist : চরমপন্থী, Farmer : জোতদার, Instantaneous : তাৎক্ষণিক, Mesmerism : সম্মোহন, Modern : আধুনিক, Red tape : লালফিতা, Renaissance : নবজাগরণ, Self-government : স্বায়ত্তশাসন, Tower : স্তম্ভ। ★



রবীন্দ্রভবনগুলিতে রবীন্দ্র-চর্চা কতটা হয় ?

পরিবর্তন নিউজ ব্যুরো

মাস ছয়েক আগে খবরের কাগজের এক অনাদৃত কোণে বেরিয়েছিল ছোট্ট একটি শল্যচিকিৎসার খবর : বামফ্রন্ট সরকারের তথ্য ও জনসংস্কৃতি দপ্তর নিয়ে নিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রভবনগুলি শিক্ষাদপ্তরের কাছ থেকে। এর সরল মানে, শিক্ষাদপ্তর ঠিকভাবে রবীন্দ্রভবনগুলি পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং বর্তমান সরকার রবীন্দ্র-ভবনগুলিকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মফস্বল এলাকায় একটা নতুন কার্যক্রম ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চান। এ ব্যাপারে পাকাপাকি সরকারি আদেশ ও কার্যক্রম ঘোষণা কদ্দূর এবং শিক্ষাদফতরেরই বা বক্তব্য কি সেসব জটিল সমস্যায় না গিয়ে বরং পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রভবন ব্যাপারে কিছু সুলুকসন্ধান নেওয়া গেল। প্রসঙ্গক্রমে কলকাতার রবীন্দ্রসদন সম্পর্কেও নানা তথ্য জানতে ইচ্ছে করে। এই সদন অবশ্য কোন অজ্ঞানিত কারণে সম্ভবত তথ্যদফতরে যাচ্ছে না, থাকছে শিক্ষাদফতরের এক্তিয়ারে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের এক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের মহাকরণে গঠিত হয় 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিক সমিতি'। তার অবৈতনিক সচিব ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত আই সি এস সুকুমার সেন। শ্রীসেন তাঁর চিঠিতে বিভিন্ন জেলা কর্তৃপক্ষকে জানান (নম্বর 155 (15)—R. T. C. C. dated Calcutta, the 26th April 1960) : রাজ্য কমিটির গৃহীত তিন পর্যায়ের অনুষ্ঠান সূচীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যেন জেলা কমিটি-গুলি রবীন্দ্র শতবর্ষ উৎসবের সূচী প্রণয়ন করেন। রাজ্য কমিটি ঘোষিত প্রথম পর্যায়ের এগারো নম্বর প্রস্তাবটি ছিল : 'Government to be requested to establish auditorium in Calcutta and district towns named after the post.'

সরকার যেখানে ঢাকে কাঠি দেন সেখানে আমলারা খুব তাড়াতাড়ি নেমে পড়েন আসরে। তবে ১৯৬০-৬১ সালে সব জেলার ম্যাজিস্ট্রেটই যে সমান কর্মদক্ষ তথা রবীন্দ্র-মনস্ক ছিলেন তা নয়। কোন কোন জেলা ও মহকুমায় বাঙালী জনগণের প্রসিদ্ধ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার রাজনীতিও ছিল। তার নিট ফল, আমরা আজ দেখছি, (১) কলকাতার রবীন্দ্রসদন ও মফস্বলের রবীন্দ্রভবনগুলির জন্য এক কোটি টাকার ওপর ব্যয় হয়েছে ও আজও নিঃসারে ব্যয় হচ্ছে (২) কোথাও টারগেট সময়ে রবীন্দ্রভবন তৈরি হয়েছে (কৃষ্ণনগর), কোথাও তৈরি হতে আঠারো বছর লেগেছে (বহরমপুর)। কোথাও স্থান নির্বাচন হতেই দশ বছর (উলুবেড়িয়া), কোথাও তৈরি হয়েছে রবীন্দ্র-ভবনের ফলক-লাগানো সিনেমা হল (শালকিয়া), কোথাও বস্তির নোংরা পরিবেশে রবীন্দ্রভবন (শ্রীরামপুর) এবং কোথাও অসম্পূর্ণ রবীন্দ্রভবন। (৩) বেশিরভাগ রবীন্দ্রভবনই নাচা গানার তীর্থস্থল, আমলা-তন্ত্রের ধামা-ধরা, রবীন্দ্র গবেষণা ও শিক্ষাক্রম থেকে বহু দূরে এবং সাময়িক সিনেমা হল অথবা সরকারী ও রাজনৈতিক সম্মেলনের জন্য ভাড়াটে হলে পরিণত হয়েছে। যাইহোক, মহান রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে জড়িত, বহুবিধ আদর্শবাদী কার্যকলাপ করতে অঙ্গীকার-বদ্ধ, আমাদের দেশের রবীন্দ্রভবনগুলি রবীন্দ্র-শিল্প সংস্কৃতি প্রসারে কতখানি যত্নশীল ও মানুষের কাছাকাছি এইসব জানতে আমরা হাজির হলাম অনেকগুলি জেলা ও মহকুমার রবীন্দ্রভবনে। তারই একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পেশ করা যাক।

আমলাতন্ত্রের নির্লজ্জতা

দূর থেকে কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনের অনেক সুনাম শোনা ছিল। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সুন্দরভাবে সংরক্ষিত। প্রচুর অনুষ্ঠান হয়। ভবনের OBJECT বিষয়ে আমাদের হাতে ছিল এক মুদ্রিত প্রস্তাব : As laid down by the Order No 204-Edn (D) dated the 18th July 1961, by the Government of West Bengal in the Education Department (Development Branch), the Rabindra Bhavan, Krishnagar may serve as a centre for the promotion of Indian culture, music, drama, cultural discussion, etc and recreative entertainment. Special stress should be given to a systematic study of Rabindra sahitya, sangeet, natika, etc. জানতে চাইলাম এই লক্ষ্য কতখানি রূপায়িত হয়েছে? উত্তরে জানা গেল সবই ফক্কা। এখানেও সেই নানা রকমের সংস্থাকে হল ভাড়া দেওয়া আর হরেকরকমবা অনুষ্ঠান। এটেকবারে হালফিল রবীন্দ্রভবনের পরিচালনায় কত্থক ও মণিপুরী নাচ, শাস্ত্রীয় ও রবীন্দ্রসংগীত নজরুল গীতির ডিপলোমা কোর্স চালু হয়েছে। সাতজন শিক্ষক শিক্ষিকা ও একজন অফিস অ্যাসিসট্যানট এ বাবদ ৫০ টাকা করে বেতন পাচ্ছেন। ছাত্রছাত্রী সংখ্যা মোটামুটি মাত্র এগারোজন।

নতুন বাংলা বছরের প্রথম দিনে আমরা যখন কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর রবীন্দ্র ভবনের সামনে এসে দাঁড়ালাম তখন ভবনে রাজ্য খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের বার্ষিক সম্মেলন হচ্ছিল তিনদিনব্যাপী। সমস্ত ভবন পতাকা আর ফেস্টুনে মোড়া। নিহত শহীদদের স্মৃতিতে নির্মিত এক বিরাট বেদী। এখানেও তাহলে ভাড়াটে ব্যবসা?

প্রশ্নোত্তরে জানা গেল এখানেও আধা সরকারি ও সরকারি সংস্থার সভা হয়, মাঝে বেশ কিছুকাল সিনেমাও চালিয়েছিলেন জনৈক ব্যবসায়ী, স্থানীয় নাট্যদল তাদের নাটকের প্রয়োজনে কাবারে নাচিয়েছিলেন।

তবে আশ্চর্য লাগলো এখানকার রবীন্দ্র ভবনে আমলাতন্ত্রের দারুণ দাপট দেখে। শোনা গেল, জেলার সর্বসাধারণ বেশ মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়েছিলেন ভবন নির্মাণে। কিন্তু ভবনের লবিতে সার সার লাগানো রয়েছে শ্বেতফলকে জেলাশাসকদের নাম ও স্তুতি। আশ্চর্য ব্যাপার। সহরের বিশিষ্ট সংস্কৃতি চর্চাকারী কৃতী ব্যক্তিদের কি কোন দানই নেই রবীন্দ্রভবনে? একটি শিলাফলকে জনৈক জেলাশাসক 'ব্যালকনির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন' করেছেন লেখা রয়েছে। প্রথম প্রশ্ন, ব্যালকনির ভিত্তিপ্রস্তর ব্যাপারটি কোন বস্তু। দ্বিতীয় প্রশ্ন, সেই ব্যালকনি কোথায়? উত্তর : অন্তর্হিত।

রবীন্দ্রভবনের আর্থিক অবস্থা কেমন? প্রতি মাসে ৫ থেকে ১০টি অনুষ্ঠান হয়। ভাড়া আড়াই ঘন্টার অনুষ্ঠানের জন্য ১৪০ টাকা, সাড়ে তিন ঘন্টায় ১৮৫ টাকা, সাড়ে তিন ঘন্টার বেশি হলে ২১০ টাকা। এছাড়া জেনারেটারের জন্য বাড়তি ৫০ টাকা। হল ভাড়া খুব বেশি নয় কি? স্থানীয় নাট্যকর্মীরা বললেন, 'আমরা মরে গেলাম।' আমরা



কৃষ্ণনগর—সাইকেলস্ট্যান্ড না রবীন্দ্রভবন

জানতে চাইলাম, স্টেজ ইকুইপমেন্ট কেমন? উত্তরে তারা বললেন, 'মাইক নেই, স্পট নেই, ডিমার নেই। আছে পাঁচটা ছেঁড়া তাই, একটা ছেঁড়া সবুজ পরদা। একটা সাদা পরদা আছে তার ধোলাই খরচ ৩২ টাকা জমা দিলে তবে ইউজ করতে দেয়। সব আমলাবাজি।

রবীন্দ্রভবনে আমলাবাজি কথাটা কৃষ্ণনগরে অনেকের মুখে শুনলাম। একেবারে গোড়া পত্তন থেকেই নাকি ভবনের কর্তৃত্ব ও কাজকর্ম শক্তহাতে চালিয়েছেন জেলাশাসকেরা। তাঁদের হুইম আর অবিবেচনা রবীন্দ্রভবনের সর্বাঙ্গে। ভবনের পেছনে অনেক হাজার টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছে শিশু উদ্যান যেখানে শহরের কোন শিশু আসে না। ভবন প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে অজস্র টাকা ব্যয়ে গড়ে উঠেছে শহীদ বাগ। রবীন্দ্রভবনে শহীদবাগ কেন?

গত বছর জাতীয় সম্প সঞ্চয় সংস্থা থেকে নদীয়া জেলা যে পুরস্কার পায় তার থেকে জেলাশাসক রানু ঘোষ রবীন্দ্রভবনকে ২৫,০০০ টাকা দেন। সেই টাকা ফিক্সড ডিপোজিটে আছে। ১৯৭৯ ও ১৯৮০ সালে বামফ্রন্ট সরকার ভবনকে দুবারে ১০,০০০ এবং ৫০,০০০ টাকা দিয়েছেন। এত টাকা দিয়ে কি হচ্ছে এখানে? শুধু বছরে একবার রবীন্দ্রজয়ন্তী করে দায় উদ্ধার? পাঠাগার কই? রবীন্দ্রচর্চা ও গবেষণা কোথায়? আলোচনা সভা হয় না কেন? শহরের সংস্কৃতিসেবীরা উপেক্ষিত কেন? দুলাখ টাকারও বেশি খরচে এতবড় যে রবীন্দ্রভবন হল, সংস্কৃতি সচেতন কৃষ্ণনগর শহরে তার ভূমিকা কতটুকু? উত্তর পাইনি।

কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবন

জমি: শিক্ষা বিভাগ প্রদত্ত সাড়ে তিন বিঘা। উদ্বোধন করেন হুমায়ুন কবীর ৪ আগস্ট ১৯৬২। আয়তন ৭০ × ৪০ ফুট মঞ্চ: ৪০ ফুট × ৪০ ফুট। আসন সংখ্যা: ৬২২। নির্মাণ ব্যয়: ২,৫৮,০০০ টাকা।

কৃষ্ণনগরের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সমিতি বছর দুই আগে রবীন্দ্রভবন কর্তৃপক্ষকে নয় দফা দাবি সনদ পেশ করেছিলেন। তার ভিত্তিতে জেলাশাসক এক 'স্টাডি টিম' গঠন করেন। এখন সেই টিম ও তার কার্যকলাপ বিশ বাঁও জলে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ তার এক সারকুলারে (No 224 EDN (D) Dated 18.1.61) যে কার্যবিধি কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে চালু করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল '(ক) অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলিকে উৎসাহ দান। খ) রবীন্দ্রভবন পরিচালক সমিতি রবীন্দ্রসংগীত সাহিত্য, নাটকের জন্য স্টাডি সারকেল রাখবেন এবং কৃষ্ণনগরের নৃত্য ও সংগীত প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখবেন। গ) শিশু চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।' আমলাতন্ত্রসেবিত কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবন দু দশক ধরে যেভাবে শিক্ষাদপ্তরের নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যাচ্ছে তার থেকেই বোঝা যাচ্ছে কেন রাজ্য শিক্ষা দপ্তর থেকে রবীন্দ্রভবনগুলি সিফটে যাচ্ছে অন্য দপ্তরে।

বাজার ও বস্তির মধ্যে রবীন্দ্রভবন

রবীন্দ্রনাথ মাটির কাছাকাছি আসতে চেয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তাই বলে ঘিঞ্জি এলাকার অবাঙালী অধ্যুষিত নোংরা ও বগড়াঝাঁটির মধ্যে রবীন্দ্রভবন? শ্রীরামপুরে তাই ঘটেছে। টিনবাজারে রবীন্দ্রভবন। ভবনে তেলরঙে আঁকা একটি প্রতিকৃতি রয়েছে। দাড়ি আছে তাই ধরে নিতে হবে ওটি রবীন্দ্রনাথের।

এই রবীন্দ্রভবন ঠিক সরকারিভাবে তৈরি হয়নি। স্থানীয় এক প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা নানান অবাঙালী মিল মালিকদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে রবীন্দ্রভবন তৈরি করেছিলেন। ঐ নেতা যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন ১৯৭৪ সালে ভবন সংস্কারের জন্য সিদ্ধার্থশংকর রায় ২৫,০০০ টাকা অনুদান মঞ্জুর করেন; ১৯৭৬ সালে মন্ত্রীমহোদয় দুটি কোম্পানির সাহায্যে নাকি ভবন সংস্কার করান ও একজস্ট পাখা লাগানোর ব্যবস্থা করান। আপাতত ভবনের বার্ষিক কার্যক্রম হল রবীন্দ্রজয়ন্তী ও শরৎজয়ন্তী উদ্‌যাপন। কোন কোন বছর বিবেকানন্দ বা নজরুল জয়ন্তীও হয়। এছাড়া মাসে গড়পড়তা ছটি অনুষ্ঠান হয়। তাতে আয় হয় ৫২০ টাকা মত। মাসিক ব্যয় তিনশো থেকে চারশো টাকা। একজন পার্টটাইম সুপারভাইজার ও একজন নাইটগারড আছেন। বেতন একশো টাকা।

শ্রীরামপুর রবীন্দ্রভবনের ঘোষিত উদ্দেশ্য: 'রবীন্দ্রচর্চা ও রবীন্দ্রসংস্কৃতির প্রসার'। সে ব্যাপারটি কতদূর? না, সেরকম কোন সুযোগ বা কার্যক্রম বিশ বছরেও নেওয়া যায়নি। তবে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছে আছে একটি রবীন্দ্রপাঠাগার তৈরি করবার, আলোচনার জন্য একটি হলঘর বানানোর। এজন্যে খরচ হবে ৫৮,০০০ টাকা। স্কিম, প্ল্যান, এসটিমেট সরকারকে পাঠানো হয়েছে বহুদিন। 'নো রিপ্লাই'। তাছাড়া ভবন সংস্কারের জন্য দরকার ৬৯,০০০ টাকা। বামফ্রন্ট সরকার কান দিচ্ছেন না। ভবন কমিটির সদস্য লক্ষ্মীকান্ত সা বললেন, "চুঁচুড়ায় এখনও রবীন্দ্রভবন তৈরিই হয়নি অথচ সরকার হাজার হাজার টাকা দিচ্ছেন। আর আমাদের তৈরি রবীন্দ্রভবনে সংস্কারের জন্যে টাকা দেওয়া হচ্ছে না।"

শ্রীরামপুর রবীন্দ্রভবন

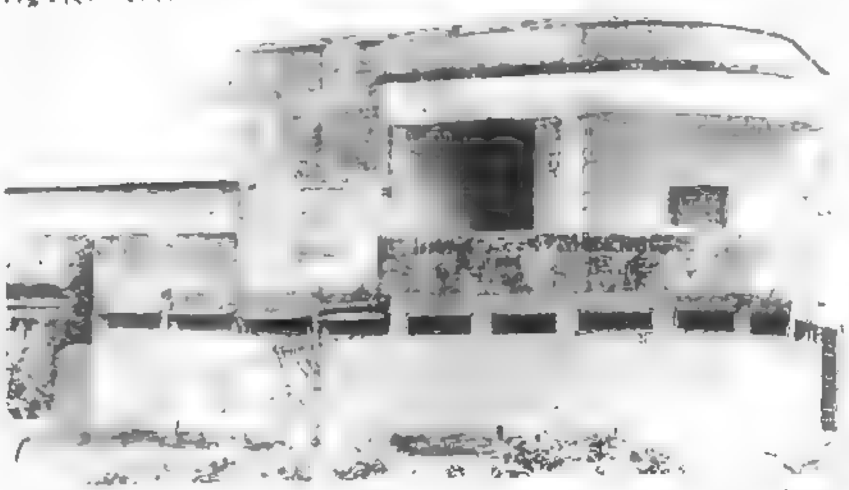
উদ্বোধন করেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬১ সালের মে মাসে রবীন্দ্র-শতবর্ষের সূচনা দিনে। নির্মাণ ব্যয় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। আয়তন ৩২০০ বর্গফুট। মঞ্চের মাপ ১২০০ বর্গফুট। দর্শক আসন ৬০০। হল ভাড়া: অনুষ্ঠান পিছু ১৩০ টাকা।

স্থানীয় নাট্যদল ও সাংস্কৃতিক কিছু সংস্থা অভিযোগ করলেন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের নেতাদের ধরলে কম টাকায় হলভাড়া পাওয়া যায়। ভবন কমিটির এক সদস্য বললেন, 'রবীন্দ্রভবনে নাটকের নামে পারটি-বাজি আমরা পছন্দ করি না।' আমরা এবারে সরেজমিনে দেখতে ঢুকলাম শ্রীরামপুর রবীন্দ্রভবনের ভেতরে। টিনের শেড, ভাঙা চেয়ার, নোংরা দেওয়াল, আলোর ব্যবস্থা অপ্রতুল। স্থানীয় একটি ছেলে বললো, 'এখানে কাংশান হলেই বস্তি থেকে টিনের শেডে দমাদ্দম ইঁট পড়বেই।'

রবীন্দ্র প্রতিকৃতি নেই

নদীয়া জেলার মহকুমা শহর রানাঘাট রবীন্দ্রভবনে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নদীয়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৮ সালের ২ জানুয়ারি পর্যন্ত। এছাড়া ১৯৭৯ সালের ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ষষ্ঠ জেলা সম্মেলন। একদা 'আলো দেখাও' নামে একটি নাটকে এই মঞ্চে ক্যাবারে নাচও হয়েছে। বলার কিছু নেই। কেননা রানাঘাট রবীন্দ্রভবনের শাসক একদা জনসাধারণের কাছ থেকে দু' হাজার টাকা তুলে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রভবনকে। বামফ্রন্ট সরকার ভবনকে অনুদান দিয়েছেন ৩৫ হাজার টাকা। সে টাকা খরচ হয়নি।

ভবনে এই মুহূর্তে করবার মত অনেক কাজ রয়েছে। রানাঘাটের বিয়াল্লিশটি সাংস্কৃতিক সংগঠন একযোগে ভবনের সভাপতি মহকুমা শাসককে যে দাবি সনদ পেশ করেছেন তার ৪২ দফা সবাইকে হতচকিত করবে। বলা হয়েছে, পুরুষদের গ্রীনরুমে জল পড়ে। অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা নেই। ভবন অলিন্দে বা বারান্দায় রবীন্দ্রনাথের মর্মরমূর্তি স্থাপন ও 'রবীন্দ্রভবন' নামাঙ্কন জরুরী।



রানাঘাট রবীন্দ্রভবন / অনিমা দাস

কোথাও 'রবীন্দ্রভবন' কথা কাট লেখা নেই। রবীন্দ্রনাথের ছবি বা প্রতিমূর্তিও নেই। তাই প্রশ্ন জাগে, ঠিক কি উদ্দেশ্যে এই রবীন্দ্রভবন হয়েছিল?

রবীন্দ্রভবন তৈরির সময় কর্তৃপক্ষ কায়দা করে মহকুমা গ্রন্থাগারটি ভবনের একটি অস্বাস্থ্যকর অংশে টেনে নিয়েছেন এবং সেই সুবাদে টেনে নিয়েছেন মহকুমা গ্রন্থাগার নির্মাণের জন্য ধার্য ৪০ হাজার টাকা। এখন রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠান থাকলে গ্রন্থাগারের কাজ শিকেয় ওঠে। গ্রন্থাগার কর্মীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন অনুষ্ঠান সামাল দিতে। জানালেন এক ভুক্তভোগী।

এই ভবনে মাসে গড়পড়তা চারটি শো হয়। প্রতি বছর বিভিন্ন সংস্থার সাহায্যে সাতদিন ব্যাপী রবীন্দ্রজয়ন্তী হয় এবং হয় কবিমিলন উৎসব (রবীন্দ্রনাথ ও নবীনচন্দ্রের মিলন স্মরণে)। গবেষণা ও রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্প কিছু নেই। রবীন্দ্রভবন কমিটির ষোলজন সদস্য আছেন এবং আছেন একজন টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসর। জনৈক মহকুমা সাইকেল স্ট্যানড চাই, অপসংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানের জন্য হল ভাড়া দেওয়া চলবে না।

কিন্তু আসল দাবি অনুচ্চারিত। রবীন্দ্র পঠনপাঠন, রবীন্দ্রচর্চা, রবীন্দ্রশিল্প শিক্ষা-কেন্দ্র করে তুলতে হবে রানাঘাট রবীন্দ্র-ভবনকে।

রানাঘাট রবীন্দ্রভবন

জমির পরিমাণ: সোয়া ৩৮ কাঠা।

উদ্বোধন: ৯ই মে ১৯৬১।

নির্মাণ ব্যয়: ১,১৪,৫৩৮ টাকা।

আসন সংখ্যা: ৫১২

হবে হবে, হচ্ছে হচ্ছে, হবেই হবে



উলুবেড়িয়া রবীন্দ্রভবন এখন যে অবস্থায় / চিরঞ্জিৎ ঘোষ

অবশেষে উলুবেড়িয়ায় রবীন্দ্রভবন তৈরি হচ্ছে লকবাজারে। কোথায় হবে তাই ঠিক করতে এখানকার জনসাধারণ এক দশকের বেশি সময় নিয়েছেন। এর মূলে মফস্বল শহরের স্থানীয় আঞ্চলিক রাজনীতির প্যাঁচ। প্রথমে ঠিক হয় বাজার পাড়ায় ভবন হবে

উলুবেড়িয়া রবীন্দ্রভবন

জমি: সরকার প্রদত্ত সাড়ে চার বিঘা। আয়তন: ১০০ ফুট × ৭৫ ফুট। মঞ্চ: ৬০ ফুট × ৬০ ফুট। আসন সংখ্যা: ১২০০।

জমি দেন জগবন্ধু সরকার। তারপরে এগিয়ে আসেন উলুবেড়িয়া কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজ চৌহদ্দির মধ্যে রবীন্দ্রভবন করবার প্রস্তাব ওঠে। নানান টালবাহানা চলে। আদালতে একটি মামলাও ওঠে এই নিয়ে। শেষ পর্যন্ত ১৯৭২ সালে সিদ্ধান্ত হয় লকবাজারে। রবীন্দ্রভবন হবে। কনস্ট্রাকশন কমিটি গঠিত হয়। কাজ শুরু হয়েছে ১৯৭৬ থেকে। টারগেট ছিল ১৯৮০ সালের মার্চ। বোধহয় এবারেও হল না। কাজ চলছে ঢিমেতালে। তবে আধানির্মিত এই ভবনেই স্টেট ব্যাঙ্কের একটি সম্মেলন ও একটি দলের রাজনৈতিক সভা হয়ে গেছে।

সম্পূর্ণ হলে উলুবেড়িয়ার ভবনটি সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের জেলা ও মহকুমা রবীন্দ্রভবন-গুলির মধ্যে বৃহত্তম বলে গণ্য হবে। প্রথমে স্কিম ছিল এক লাখ টাকার। এখন দাঁড়িয়েছে দশ লাখ। পূর্বতন শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় দু' লক্ষ টাকা দিয়ে-ছিলেন। জেলা স্বল্প সঞ্চয় পুরস্কার থেকে পাওয়া গেছে দু' লক্ষ টাকা। এছাড়া ভবন নির্মাণ সম্পূর্ণ করার জন্য এক লক্ষ টাকা সাহায্য ও দু' লক্ষ টাকা ঋণের সারকুলার অনুযায়ী এক লক্ষ টাকা এসেছে। হয়ত এ বছরেই কোনদিন উলুবেড়িয়ার বিশাল রবীন্দ্রভবনের নির্মাণকাজ শেষ হবে। তারপর এই বিরাট মঞ্চগৃহে কি হবে কেউ কি জানে?

সিনেমা হল না রবীন্দ্রভবন ?



সিনেমা হল, না রবীন্দ্রভবন ? 'শিবানী' : সালকিয়া, হাওড়া/দীপঙ্কর ভট্টাচার্য

বেড়ানোটা বার হলো উলুবেড়িয়ায়। 'এখান-কার রবীন্দ্রভবন নির্মাণের একজন কর্তাব্যক্তি বললেন, '১৯৬১ সালেই আমরা এখানকার রবীন্দ্রভবনের জন্যে ৫০/৬০ হাজার সংগ্রহ করে ফেলেছিলাম। তার থেকে একটা বড় অংশ হাওড়ার এক প্রভাবশালী নেতা ও মন্ত্রী নিয়ে যান জেলা রবীন্দ্রভবন করবার জন্য।'

জানতে চাইলাম হাওড়ার জেলা রবীন্দ্র-ভবনটি কোথায় ? জানা গেল, সালকিয়ার শিবানী সিনেমা হলে। আশ্চর্য ব্যাপার ! ক্যামেরাম্যান নিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম অকুস্থলে। সরু গলির মধ্যে সিনেমা হল। অবাঙালি এলাকা। কাছাকাছি কোথাও চোলাই মদের ঘাঁটি আছে বোধহয়। গন্ধে মালুম হচ্ছিল। শিবানী সিনেমায় চলছিল 'এ' মার্কা হিন্দি ছবি। সিনেমা হলের সামনে ফিল্ম হোর্ডিঙের পাশে শ্বেতপাথরে রবীন্দ্রসদনের 'বেত্তান্ত' জানা গেল। বিধান চন্দ্র রায়ের দ্বারা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত ও অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা উদ্বোধিত এই রবীন্দ্রসদনটি কোথায় ? তার কাজই বা কি ? একই অঙ্গে এত রূপ ? সিনেমা-কাম-রবীন্দ্র-সদন ! উলুবেড়িয়ায় রবীন্দ্রভবনের জন্য সংগৃহীত অর্থের সিংহভাগ কোথায় গেল ? এসব প্রশ্নের জবাব না পেয়ে আমরা অধোবদনে চলে এলাম। রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত এমন অপমান এদেশেই চলছে এবং চলবে ?

ভদ্রলোকের রবীন্দ্রচর্চা

গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি, সৌখিন পাজামা, ঘাড়ে পাউডার, গায়ে ইনটিমেট, গালে খরগোশের মত বক্ত আর সন্দেশের মত সাবধান পুত্র। দেখলেই বুঝবেন রবীন্দ্র-সদনের দর্শক। আর রবীন্দ্রসদনের অনুষ্ঠান মানেই 'মায়ার খেলা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', জাতীয় ব্যাপার। কোন না-কোন সংগীত বিদ্যালয় বা গ্রুপ প্রযোজিত এই সংস্কৃতির খেলা কলকাতায় লেগেই আছে।

মফঃস্বলের রবীন্দ্রভবনগুলোয় যেখানে মাসে গড়ে চারটে থেকে ছটা শো হয় সেখানে কলকাতায় রবীন্দ্রসদনে মাসের তিরিশদিনই ফাংশন। মঞ্চের তারিখ পাওয়ার জন্যে হুড়োহুড়ি, ধরাধরি। ভাড়া সান্ধ্য অনুষ্ঠানে ১ হাজার টাকা, প্রভাতী অনুষ্ঠানে ৭৫০। ব্যাপারখানা কি ? আসলে কলকাতায় সেনটার প্লেসে এত সস্তায় এয়ার কনডিশনড হল আর কই ? সংস্কৃতি কে সংস্কৃতি, রবীন্দ্র-নাথ কে রবীন্দ্রনাথ, আবার খাসা আউটিং, ফোয়ারার ধারে প্রেম, ফুচকা ঘুড়িমশলা ও কোয়ালিটির পানচ, খোঁপায় বেলফুলের জেল্লা। বাঙালি আর কি চায় ?

এদিকে জাঁকালো কার্যনির্বাহক সমিতি আছে। আছেন ৭০০-১৬০০ বেতনক্রমের প্রশাসন আধিকারিক (মফঃস্বলে নেই কেন ?) ও অন্যান্য সহকারী। সমিতির/সভাপতি উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী, সহসভাপতি তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী। আছেন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী, দুই আই এ এস সচিব এবং কলকাতায় শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্য ও রাজনৈতিক জগতের গুণে গুণে কুড়িজন সদস্য। কিন্তু ফলং অষ্টরম্ভা। আসলে যথার্থ প্ল্যান নেই। অথচ আছে শিক্ষা ও তথ্যদপ্তরের ক্ষমতার লড়াই। এখানে রাজনৈতিক প্যাঁচে এম এল এ বনে যান কবি। সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র জয়ন্তীর শিল্পী ও বক্তা নির্বাচনে অদ্ভুত খোল পালটে যায়।

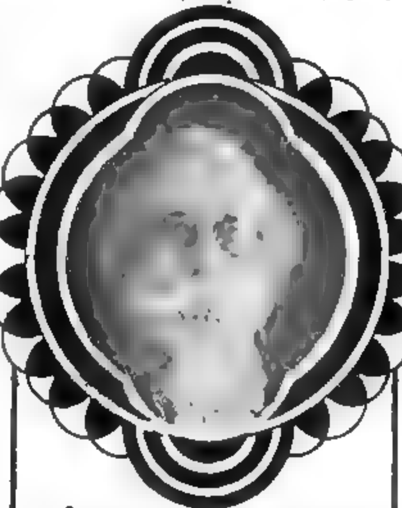
সদন কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে জানান দিয়েছেন : 'জাতীয় রঙ্গশালা হিসাবে রবীন্দ্র-সদনের উদ্দেশ্য—রবীন্দ্রনাথ তথা ভারতীয় ভাবধারার প্রচার ও প্রসার। আমাদের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও উজ্জীবন ঘটানোই রবীন্দ্রসদনের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।...রবীন্দ্রসদন পরিকল্পনায় যারা রূপকার তাঁরা এই রঙ্গশালাকে একটি বিবিধার্থ সাধক প্রতিষ্ঠান রূপেই গড়ে তুলতে চেয়ে-ছিলেন—নিছক প্রেক্ষাগৃহমাত্র রূপে নয়।' উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু ঘোষিত উদ্দেশ্য কতটা রূপ পেয়েছে ? কলকাতা তথা সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে এই বাতানুকূল প্রেক্ষাগৃহ কি কি বিবিধার্থ সাধন করেছে জানতে ইচ্ছা হয়।

রবীন্দ্রসদনে একটি রবীন্দ্রপ্রাসঙ্গিক গ্রন্থাগার ও গানের সংগ্রহশালা আছে। কিন্তু সে সম্পর্কে কতজন অবহিত ? এতবড় অডিটোরিয়ামে যে কোন গ্রুপ থিয়েটার দর্শক সংগ্রহ করতে হিমসিম খেয়ে যায়। তারা তাই বেছে নিয়েছে অ্যাকাডেমি মঞ্চ। রবীন্দ্র গবেষণা এখানে কদ্দুর জানতে চাইলে জানতে পারবেন : 'সদনের উত্তর-প্রাঙ্গণে প্রস্তাবিত মুক্তাঙ্গন-মঞ্চের সঙ্গে পরিকল্পিত ত্রিতল ভবনে থাকবে গ্রন্থাগার, গবেষণাকেন্দ্র রবীন্দ্র-সংগ্রহশালা ইত্যাদি। পরিকল্পনা রূপায়ণের পর গ্রন্থাগারটি রবীন্দ্র-গবেষণার কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হবে।'

ততদিন আমাদের উদ্বাস্তু হয়ে থাকা ছাড়া গতি কি ? ★

রবীন্দ্রসদন, কলকাতা

জমির আয়তন : ৯ বিঘা (২৮,৮০০ বর্গফুট)। প্রেক্ষাগৃহের আয়তন : ১ তলা ৪,৮০০ বর্গফুট। দোতলা ২,৫৫০ বর্গফুট। মঞ্চ : বিস্তার ১১৪ ফুট, গভীরতা ৫০ ফুট। নির্মাণব্যয় ৪,৫০০,০০০ টাকা। আসন সংখ্যা : ১১০৮



কাঁচা আর পাকা রবীন্দ্রনাথে পঞ্চাশ পয়সার তফাৎ

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে যে ক'জন মনীষীদের নিয়ে আমাদের কৃষ্টি, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রবক্তারা বিশেষভাবে চিন্তা করছেন তাঁদের অন্যতম রবীন্দ্রনাথ। এই হৈ চৈ-এর মধ্যে একটি বিশেষ বিষয় হল রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভালোবাসা ও যথাযোগ্য সম্মানে প্রদর্শনের জন্য যে কোনো ভাবে তাঁর একটি আবক্ষ বা পূর্ণ মূর্তি বা চিত্রিত প্রতিকৃতির প্রতিষ্ঠা।

আমাদের অল্পে খুশি হওয়ার একটি বিশেষ মানসিক অবস্থা সবসময় কাজ করছে। মন্দকে ভালোর আলোয় দেখার ফল আমরা ভোগ করছিনা এমন নয়। একটু নজর দিন ছোটদের খেলনার দিকে—সম্ভবত আমাদের দেশেই এমন খোঁচ বের হওয়া খেলনা নিশ্চিন্ত ও পরমস্নেহে আপ্লুত হয়ে উপহারস্বরূপ তুলে দিয়ে শিশুকে কৃতার্থ করি। এর অর্থ এই নয় যে আমরা ভালো খেলনা তৈরি করতে পারি না। আসলে 'চলে যাচ্ছে' মনোবৃত্তিই সুন্দর, সুচারু আর রুচিসম্মত রচনা থেকে আমাদের ক্রমাগত দূরে ঠেলে দিচ্ছে প্রতিকৃতির আলোচনাতেই। দেখুন—রাস্তাঘাটে ফটো তোলার অসংখ্য স্টুডিও। সেখান থেকে তোলা যে ছবি আমার হাতে তুলে দেওয়া হল আমি তাতেই খুশি; তাতেই আমার ছবি তোলার স্বার্থ পূর্ণ হল। একবারও ভেবে দেখতে চাইলুম না ফটোগ্রাফিক শিল্প বিচারে তা কতটা উত্তীর্ণ। আমাদের চিত্রিত ও ভাস্কর্যায়িত প্রতিকৃতি রচনার ক্ষেত্রেও প্রায় সেই একই মন কাজ করছে।

প্রতিকৃতি চিত্র-চিত্রণ ও ভাস্কর্যে আজকের মানসিকতা আমাদের দৃষ্টিতে আরোপিত হয়েছে পাশ্চাত্য শিল্প ঐশ্বর্য থেকে। আমরা নিজেরাও যে এক সময়ে প্রতিকৃতি রচনায় এক বিশেষ সৃষ্টিতে অভ্যস্ত ছিলুম, তা প্রায় ভুলেই গেছি এবং সে বিষয়ে তাই ভাবতেও চাই না। কিন্তু বিস্ময়ের ঘটনা হল, যে ইউরোপীয় প্রতিকৃতিধর্মী চিত্র রচনায় আমরা নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলেছি সেখানেও বিরাট পরিবর্তনের সূচনা ঘটেছে। ম'াতিস, সেজাঁ, ভ্যান গগ-এর পরের যুগের শিল্পীদের মধ্যেও এর প্রভাব পড়েছে। অর্থাৎ প্রতিকৃতি একেবারে প্রতিবিম্বিত না হয়ে তার সঙ্গে ব্যক্তি চরিত্রের বিশেষ গুণ প্রকাশের চেষ্টা দেখা দিয়েছে।

ভারতীয় প্রতিকৃতিশিল্প রচনায় প্রতিকৃতি বলতে কেবলই বাইরের অবয়বকে যথাযথ ভাবে চরম মনে না করে, ঐ বাইরের মুখচ্ছবির মধ্য দিয়েই ভেতরের মানুষটির পরিচয় ঘটিয়ে দেবার একটি বিশেষ সাধনায় রত থাকতেন শিল্পীরা। রবীন্দ্রনাথ থেকে পেছন ফিরে গান্ধার যুগের প্রতিকৃতিশিল্প রচনার দিকে দৃষ্টি দিলেই এর আভাস পাবো। গান্ধার শিল্পে তথাগতের বোধিবৃক্ষতলে প্রতিমূর্তিটি ভাস্কর্যায়িত হয়েছে। সেখানে গ্রীক ভাস্কর দীর্ঘদিন খেতে না পাওয়া বুদ্ধের শরীরের যে পরিণতি তাকেই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ঐ একই অবস্থার বুদ্ধকে ভারতীয় ভাস্কররা দেখলেন পূর্ণ রূপে—তাঁরা বাইরের আবরণের মধ্য দিয়ে সাধনায় মগ্ন অন্তরের দেবত্বকে প্রকাশ করলেন। এই হল দুই শিল্পীর দৃষ্টি ও গ্রহণে তারতম্যের স্বরূপ।

প্রতিকৃতিধর্মী শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে অবয়বের প্রতিচ্ছবির পরিচয়ে চিত্রের মূল দর্শনসহ ভেতরের মানুষটিকে দেখবার বাসনা ত্যাগ করতে পারছিনা। রবীন্দ্র প্রতিকৃতি রচনার ক্ষেত্রেও ঐ ভাবনা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথে তাঁর অনন্ত সাধনার মধ্য দিয়ে কাকে পেতে চেয়েছিলেন? এত সৃষ্টি কাকে উপলক্ষ করে? কার উদ্দেশ্যে সমর্পিত হয়ে বলে উঠেছেন—"প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে", "তোমার অসীমে", "তব দয়া দিয়ে হবে গো"? ঐ উৎসর্গিত, নিবেদিত জীবনের কথা শিল্পীকে ভাবতেই হবে।

কেবল মুখচ্ছবির প্রতিফলনকেই যদি মৌলিক প্রতিকৃতি রচনার স্বীকৃতি দিই তাহলে আর কারুর পক্ষে হোক না হোক অন্তত রবীন্দ্রনাথের প্রতি যথার্থ বিচার করা হবে না। আমরা আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে খুশি হতে পারছিনা কেন? শিল্প রচনার মধ্য দিয়ে যে প্রতিকৃতি তারে পূর্ণতার সঙ্গে দর্শকদের যথার্থ পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব শিল্পী এড়িয়ে যেতে পারেন না। এবং পারেন না বলেই তা কেবলই মাত্র প্রতিচ্ছবি নয়।

সবিনয়ে বলি—আমরা অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করি তাঁর কিছু নৃত্যনাট্য আর গানের ভেতর দিয়ে। এই দেখে আর শুনে কেবলই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বুঝি আর কোনো কিছু আমাদের জন্য রেখে যাননি। রবীন্দ্ররচনার অমৃতস্বাদ থেকে আমরা প্রায়শই বঞ্চিত এবং এই বঞ্চনা থেকে মুক্তির উপায় খোঁজার সময় এসেছে।

রবীন্দ্র প্রতিকৃতি চিত্র রচনার পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রাসঙ্গিকতা হল, রবীন্দ্র প্রতিকৃতি রচনার ক্ষেত্রে প্রায়ই ফটোগ্রাফিক প্রতিবিম্বকেই কার্যকরী পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এ ধরনের প্রতিকৃতি রচনা অবশ্য রবীন্দ্র-তিরোধানের পরই অবশ্যম্ভাবী ভাবে স্থান করে নিয়েছে। আমাদের আলোচ্য পরিক্রমার মূল লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের সৃষ্টিগুলি। আজকে যে সময়ে বসে আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিশিল্প রচনার বিশেষ সমীক্ষা করছি তা আমার মনে হয় কেবলই রবীন্দ্রনাথের পরিণত জীবনের শেষ অধ্যায়কে ধরে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি উৎস সন্ধানে একটি বিষয় স্পষ্ট, তা হল, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর ছেলেবেলা থেকে জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত চিত্রিত-চিত্রের একটি পরিচ্ছন্ন গতিপ্রবাহ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে অনন্য এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্। এই প্রবহমান গঙ্গোত্রীর গোমুখ হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্ভবত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম ও প্রধান শিল্পী যাঁর পটে প্রথম রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত হলেন। এ চিত্রশালায় রবিকে সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রাণ-চঞ্চলতায় ধরেছেন—বিশেষ করে দুটি বিশেষ মুহূর্তে কত সহজে ও সাবলীলভাবে জ্যোতি-কাকা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতিভার স্পর্শচিহ্নটি সারা মুখমণ্ডল ও ভঙ্গীতে এঁকে দিয়েছেন। এ চিত্র কি কেবলই প্রতিকৃতি? কেবলই রেখাচিত্র? না। রেখার ছন্দে, মুখের আদলে একজন অসাধারণ উজ্জ্বল আত্মমগ্ন যুবককেই প্রতিবিম্বিত করে অক্ষয় করেছেন। পরিচ্ছন্ন, সীমিত রেখাচিত্র দুটিতে অঙ্কনের রবির আর গানের রবির কি অসাধারণ তন্ময়তার প্রকাশ-আস্বাদন! জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত চিত্রগুলির সহজ সরল সাবলীলতা ছাড়াও যে বস্তুটি মাখা হয়ে আছে তা হল ভালবাসা ও স্নেহ।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি রচনার শ্রেষ্ঠ ও অনন্যতম শিল্পী হলেন অবনীন্দ্রনাথ। ইউরোপীয় রীতি কৌশলে শিক্ষালাভ করেও কত সহজেই তাকে অতিক্রম করে মৌলিক রচনার একটি শ্রেষ্ঠ উপহার দিলেন, ত্রিশ বছরের কাছাকাছি পূর্ণতায় ধন্য সাহিত্যসেবী রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ প্রতিকৃতি চিত্রটি (প্যাস্টেলে) শুধু প্রতিকৃতি হিসাবেই নয় যথার্থ শিল্পদৃষ্টিতে এ এক অদ্বিতীয় রচনা।

অবনীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রচিত্রমালার মধ্যে দিয়ে ভারত শিল্প আরও কিছু অসাধারণ প্রতিকৃতি সম্ভারে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে আছে অন্ধ বাউলবেশী

রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ধোয়া রঙ-এর কাজ-গুলি। রবীন্দ্রনাথকে বাউল সাধক হিসাবে চিহ্নিত করার অনুপ্রেরণা রবীন্দ্রসঙ্গ ও সাহিত্য। রসসিদ্ধ বাউল সাধকের ঈশ্বরের জন্য উন্মাদনার ভঙ্গীর মধ্য দিয়েই চেতনাদের অনুভূতিতে পৌঁছানোর স্পর্শ স্পষ্ট। এই চিত্র যে সত্য প্রকাশ করে তা হল—'রবিকাকা' ছাড়াও আর একটি বিশেষ শক্তির স্পর্শ তিনি



শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুভব করেছিলেন। কেবল আত্মজন বা প্রিয়জন বলেই নয়, দুজনেই ছিলেন অনন্ত অনুভূতির পথের পথিক। তাই অবনীন্দ্র-নাথের পক্ষেই 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ"-এর ওপর রবীন্দ্রনাথকে দেখা সম্ভব হয়েছিল। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলে প্রসঙ্গটি আরও স্পষ্ট হবে। অবনীন্দ্র-শিষ্য প্রখ্যাত প্রয়াত শিল্পী প্রশান্ত রায় যখন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অবনীন্দ্রনাথের কাছে এসে বসতেন, তাঁর গল্প করতেন, তখন অবনীন্দ্রনাথ বলতেন, "বেশি কাছে যেওনা, ছাই হয়ে যাবি—একেবারে আগুন।" ঐ 'আগুনের পরশমণি" ছোঁয়াতেই অবনীন্দ্র-নাথের আরও একটি অসাধারণ চিত্র—"সমুখে শান্তি পারাবার"—রবীন্দ্র তিরোধানের এমন শান্ত সমাহিত নিরুদ্বিগ্ন অথচ প্রবহমান চিত্র এর আগে সৃষ্টি হয়নি। এর আগে মৃত্যুকে এত পবিত্র শুভ্র ও অনন্ত দ্যুতিতে দেখা হয়নি। রবীন্দ্র তিরোধানের চিত্রটি জলরঙে ও ক... কিন্তু প্রথম চিত্রটি হারিয়ে যাওয়ার পরে শিল্পী এই মহামূল্য চিত্রকে স্মরণ করে আরও একটি ছোটোর কাজ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে আরও একটি অসাধারণ চিত্র রচিত হয় অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। শিল্পী তিন মনীষীকে একত্রে একটি বিশেষ মুহূর্তকে ধরেছেন। এই তিন ব্যক্তি হলেন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও রবীন্দ্র অনুরাগী চার্লি (দীনবন্ধু এনড্রুজ)। আঁকা হয়েছে জলরঙে, 'ধোয়াই' পদ্ধতিতে। বর্ণের ব্যবহার এই চিত্রকে বিষয়ের সঙ্গে আরও গভীর করেছে। এই তিনের সমাবেশ কেবলমাত্র প্রতিকৃতি সম্মেলনের চেষ্টা নয়, এই মিলন একটি বিশেষ চিত্তবৃত্তের স্পর্শই আমাদের কাছে এনে দেয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি মুহূর্তের ভাবনার বার্তা বহন করে। এই চিত্রের সঙ্গে আরকাইভ কথাটি জুড়ে দিলে আশা করি খুব বেশি বলা হবে না। বর্ণের ব্যবহারে যে দৃষ্টিতে এটি অনন্য তা হল প্রকৃতি ও আকৃতি অনুযায়ী তাদের বর্ণের প্রলেপে ভাবা।

একই বাড়ির বারান্দায় বসে আর একজন রবীন্দ্র প্রতিকৃতি চিত্রকর হলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কালোয় সাদায় মেশা রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার জীবনকে দেখেছিলেন মনকে আর চোখকে বেশ পেছনে নিয়ে গিয়ে। যথাযথ ভাবে খুঁজে পেতে সমর্থ হয়েছিলেন বালক ও কিশোর রবি-কাকাকে।

গগনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের একটি অসাধারণ পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি রচনা করে গেছেন, যাকে 'আমরা মনুমেনটাল ওয়ারকের পর্যায়ভুক্ত করতে পারি। মনুমেনটাল

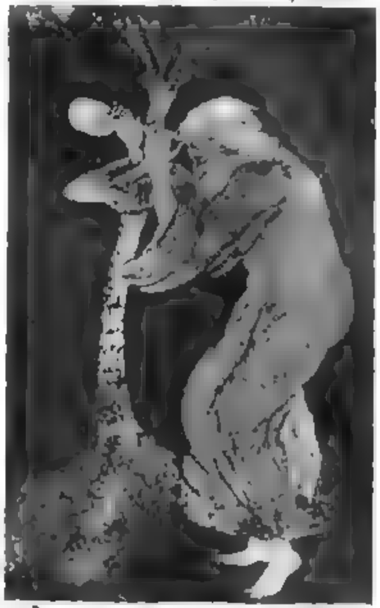


শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওয়ারকের বিন্যাস ধরা আছে গগনেন্দ্রনাথের আঁকা অধিবেশনে "ভাবমগ্ন রবীন্দ্রনাথ" চিত্রটিতে। রবীন্দ্রনাথের নিছক পূর্ণাবয়ব প্রতিচ্ছবিই নয়, এ ছবি রবীন্দ্রনাথের বিরাটত্বের একটি অনন্যসাধারণ প্রতীক। এখানে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র দীপ্তিমান দ্যুতি।

অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথের পর আচার্য নন্দলাল, অসিতকুমার হালদার, মুকুল দে। এঁদের চিত্রিত রচনার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখব নন্দলাল কোন দিনই রবীন্দ্রনাথকে নিঃসঙ্গ ভাবে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না। রবীন্দ্র-নাথকে সবসময় চিত্রিত করেছেন কবির নিজস্ব সৃষ্টি সাধনার মধ্য দিয়ে। শ্রীনিকেতনে করা ম্যুরালধর্মী দেওয়ালচিত্র 'হলকর্ষণ' একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বাস্তবপক্ষে কয়েকটি আঁচড়ের ভেতর তিনি সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে অদ্ভুত আত্মমগ্নতায় ধরেছেন। নিজের সৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে দেখার এই চোখ নন্দলালের পরবর্তী ছাত্রদের প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্র-নাথের জীবন, সৃষ্টি ও ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়েছিলেন নন্দলাল ; আর সেই সান্নিধ্য তাঁর রচনায় ছাপ রেখেছে স্পষ্টতই।

অসিতকুমার হালদারের রবীন্দ্র প্রতিকৃতির ভেতর যেটা সবচেয়ে উত্তীর্ণ তা হল 'রবি বাউল'। রবীন্দ্রনাথকে বাউল ভাবে দেখে তাকে রূপ দিয়েছেন অসিতকুমার। এখানেও রবীন্দ্রনাথ কেবলই স্থির প্রতিকৃতি নয়—



শিল্পী অসিত হালদার

রবীন্দ্রনাথ এখানে ছন্দোময়। তবে আমার মনে হয় এই বাউলবেশী রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রকৃত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রসানুভূতির পার্থক্য বর্তমান। অবনের 'রবিকাকা' চিরন্তন মুক্তির প্রতীক। অসিতকুমার রবি বাউলকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তন্ময় নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে রাঢ় অঞ্চলকে বোঝাবার জন্য খেজুর গাছের ব্যবহার করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ সে ক্ষেত্রে তাঁকে সসীম থেকে অসীমে উত্তীর্ণ করেছেন।

মুকুল দে এই বর্তমানের অনন্য প্রতিনিধি। শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে খুবই নিকট থেকে দেখেছেন। খুবই স্নেহ পেয়েছেন। মুকুল দে নানান ভাবে রবীন্দ্রনাথকে আঁকলেও শিল্পীর করা ধাতবপাতে রবীন্দ্রনাথের স্থির অনুভূতির থেকে মুক্ত।

শিল্পী অতুল বসু রচিত রবীন্দ্র প্রতিকৃতিটি ইউরোপীয়করণ কৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে একটি অনন্য নিদর্শন। এটি আবক্ষ এবং কাগজে সামনে রেখে তিনি তা রচনা করেছেন। শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে প্রতিকৃতির আলোকে দেখা ছাড়া প্রতিকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির সাযুজ্যের কথা ভাবেননি। মুখচ্ছবির যথাযথ প্রতিবিম্ব হিসাবে এর গ্রাহ্যমূল্য অসীম।

যামিনী রায়ের করা গান্ধীজী ও রবীন্দ্র-নাথের প্রতিকৃতিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে রাখা আছে। এই ছবির ভেতর দিয়ে আমরা কখনই শিল্পী যামিনী রায়ের স্পর্শ পাই না। যামিনী রায়ের স্পর্শ বলতে তাঁর লোকধর্মী

চিত্রের কথা বলছি না, তাঁর রেখাভিত্তিক কাজের ধরন, ধাঁচ ও ছাঁচের কথা বলছি, যেখানে মুহূর্তে চেনা যায় সৃষ্টির মধ্য দিয়ে স্রষ্টাকে। এখানে শিল্পী নিছক একটি ফটো চিত্রেরই রঙীন (স্পর্শ ছোপের) অনুলিপি করেছেন। মুহূর্তে চেনার যে আলো তা থেকে বঞ্চিত এই রচনা।

নন্দলাল ও তাঁর সমসাময়িক শিল্পীদের পর রবীন্দ্র প্রতিকৃতি রচনায় অন্যতম শিল্পী হলেন রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বিনায়ক রাও মাসোজী, মণিভূষণ গুপ্ত, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা— এঁরা সবাই রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছিলেন এবং সেই কারণে এঁদের রচিত প্রতিকৃতিগুলি জড়তাহীন, সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। বিশেষভাবে রমেন্দ্রনাথ আশ্রম জীবনের সঙ্গে প্রাত্যহিক রবীন্দ্রনাথকে তাঁর চিত্রমালার মধ্যে একটা ঐতিহাসিক মূল্যে দাঁড় করিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে নৃত্য-নাট্য, সাহিত্যসভা ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবত তিনিই একমাত্র শিল্পী যিনি নানান ধরনের ছাপাই কাজের মধ্য দিয়ে কবিকে দেখেছেন।

শান্তিনিকেতনে সব শিল্পীই রবীন্দ্রনাথকে যে চোখে দেখতেন সেই চোখের দেখাকেই চিত্রে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। আমাদের দেশে যেমন পরিচিত অপরিচিত বহু শিল্পী তাঁদের শ্রদ্ধার নমস্কার জানিয়েছেন নিজেদের চিত্রিত প্রতিকৃতি রচনার মধ্য দিয়ে তেমন রবীন্দ্র প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে চিত্রপটে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন বিদেশের যুগশ্রেষ্ঠ শিল্পীরাও। সব শিল্পীর কাজ আমাদের চোখের সামনে নেই; তবু যে কটি অনন্য-সাধারণ প্রতিকৃতি পেয়েছি তার তুলনা নেই। এই প্রতিকৃতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়ের যা তা হল এঁরা স্বদেশী (ইউরোপীয়) শিল্প করণ কৌশলে নিপুণ হয়েও রবীন্দ্রনাথকে প্রাচ্যের অন্যতম প্রতিনিধি ও তাঁর ব্যক্তি-মানসিকতার অসাধারণ মননের মধ্য দিয়েই প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। রবীন্দ্র চিন্তায় ও ভাবনায় একটা মূল সুরের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হতে পারলে এটা সম্ভব নয়। প্রখ্যাত শিল্পী রোদেনস্টাইনের করা রবীন্দ্র প্রতিকৃতির দিকে নজর দিন, কী সাবলীল অথচ ভারতীয় অনুভূতিতে সিক্ত ঐ রেখার ব্যঞ্জনা। এই রেখাগুলিসহ রবীন্দ্র প্রতিকৃতির দিকে নজর দিলেই তৎক্ষণাৎ আমাদের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের করা রেখাচিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। কী অসম্ভব মিল! জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অত্যন্ত নিকট থেকে রবীন্দ্রনাথকে যে আলোকে সহজভাবে দেখে প্রকাশ করেছেন রোদেন-স্টাইনের কাজের মধ্যেও সেই সুরের অনুরণন।

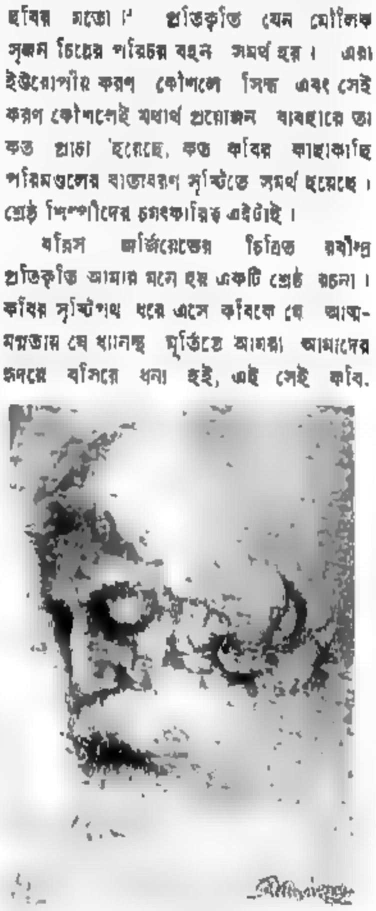
রোদেনস্টাইনের কাজ ছাড়িয়ে আর একটু এগিয়ে এসে ধাতবপাতে করা ম্যুর হেড বোনের রবীন্দ্র প্রতিকৃতির পাশে এসে



শিল্পী মুরহেড বোন

দাঁড়ান। দেখবেন অনন্তপ্রসারী দৃষ্টিতে কবি আত্মস্থ হয়ে আছেন। এই রচনাগুলি কেবলই প্রতিকৃতির প্রতিবিম্বিত অনুসরণ নয়, এগুলি প্রতিকৃতিসহ একটি মূল মানুষের অন্তরলোকের পরিচয় বহন করে। এ কথা আগেই বলেছি যে ইউরোপীয় দৃষ্টিতে আমরা প্রতিকৃতি বিচার করে অভ্যস্ত তা কত ভ্রান্ত তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল এই সব চিত্রিত প্রতিকৃতি। শুধু চিত্রিত প্রতিকৃতিই নয়—ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও সেই একই অনুভূতি কাজ করেছে। মৌলিক সৃজনধর্মী প্রতিকৃতি বলতে আমি এগুলিকেই মনে করি। আমাদের বুঝতে হবে প্রতিকৃতি দেখে কেউ যেন বলে না ফেলে, 'দেখ, ঠিক ছবির মতো!' প্রতিকৃতি যেন মৌলিক সৃজন চিত্রের পরিচয় বহন সমর্থ হয়। এরা ইউরোপীয় করণ কৌশলে সিদ্ধ এবং সেই করণ কৌশলেই যথার্থ প্রয়োজন ব্যবহারে তা কত প্রাচ্য হয়েছে, কত কবির কাছাকাছি পরিমণ্ডলের বাতাবরণ সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে। শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের চমৎকারিত্ব এইটাই।

বরিস জর্জিয়েভের চিত্রিত রবীন্দ্র প্রতিকৃতি আমার মনে হয় একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। কবির সৃষ্টিপথ ধরে এসে কবিকে যে আত্ম-মগ্নতায় যে ধ্যানস্থ মূর্তিতে আমরা আমাদের হৃদয়ে বসিয়ে ধন্য হই, এই সেই কবি,



শিল্পী বরিস জর্জিয়েভ

যেখানে একমাত্র আত্মস্থ ধ্যানমগ্নতাই মুখ্য আর সব গৌণ। এ রচনা ছাড়াও শিল্পী আরো দ্রুত রেখাধর্মী কাজের ভেতর দিয়ে কবির প্রতিকৃতি রচনা করেছেন। জাপানী শিল্পী কে মাৎসাহারার রচিত প্রতিকৃতিতে অন্তর্মুখিতার সঙ্গে দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ স্পষ্ট।

চিত্র চিত্রণ ছাড়া আর একটি ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ বিষয় হিসাবে অনন্য। আলোচনার শুরুতেই একটি ঘটনার উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। যারা ইদানীং শান্তি-নিকেতনে গেছেন তারা দেখবেন—আশ্রম উপাসনা মন্দির ও রবীন্দ্র ভবনের কাছাকাছি রাস্তার ধারে কিছু লোক নানান ধরনের মাটির পুতুল বিক্রি করে থাকে। ঐ পুতুলগুলির ভেতর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ ও আবক্ষ বিরাজ করেন। সেই মূর্তি কেনার ইচ্ছের যদি দাম জিজ্ঞাসা করেন তা হলে প্রশ্ন শুনবেন—কাঁচা রবীন্দ্রনাথ না, পাকা রবীন্দ্রনাথ? যে মূর্তিকে পুড়িয়ে নেওয়া হল তিনি হলেন পাকা রবীন্দ্র-নাথ আর যাকে পোড়ানো হয়নি তিনি হলেন কাঁচা রবীন্দ্রনাথ। মূল্য বিচারে পঞ্চাশ পয়সার ফারাক!

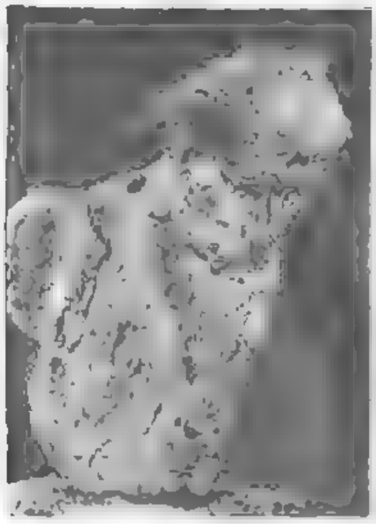
রবীন্দ্রনাথের ভাস্কর্য রচনার ক্ষেত্রেও আমরা ঐ কাঁচা আর পাকাতেই রয়ে গেলুম। পথ চলতি রাস্তার মোড়ে পাবেন অসংখ্য রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ ও আবক্ষ, ক্ষত-অক্ষত আবৃত আছেন।

নানান সময়ে নানান বয়সে নানান পরিবেশ ও পরিমণ্ডলে নানান ভঙ্গীতে রবীন্দ্র-নাথের অসংখ্য স্থির চিত্রের উপহার দিয়েছেন অসংখ্য নামী অনামী চিত্রশিল্পীরা। কিন্তু বিস্ময়ের কথা – যখনই রবীন্দ্রনাথকে মূর্তির ভেতর দিয়ে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে তখনই তিনি কেবলই জোব্বাপরা চেহারায় হাজির হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের এই পোশাকের ছবি কোন পরিবেশে ভাল সে কথা বুঝতে চাই না। আমার কেবলই মনে হয়—সারা শরীর ঢাকা রবীন্দ্রনাথকে ধরা সোজা বলেই আমরা ঐ মূর্তি করতে ভালবাসি না তো? এই বিশেষ পোশাকে রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগর থেকে সোজা রবীন্দ্র সদন পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। রবীন্দ্র সদনকে ডানহাতে ফেলে একাডেমির দিকে এগিয়ে গেলে মনে হবে আপনি একটি অ্যানিমেটেড ছবি দেখছেন। রবীন্দ্র সদনে জোব্বা পরিহিত রবীন্দ্রনাথকে সামনে থেকে দেখে দুপা এগুলি দেখব পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ একাডেমিতে। ভাস্কর্যের রীতিকৌশলের ও রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমনীষার নিরিখে কতটা উত্তীর্ণ এই মূর্তিগুলি? আয়নার মধ্যে নিকৃষ্ট রুচিতে পরিবেশিত বাল্মিকী বেশী রবীন্দ্রনাথকে ধরে রাখার চেষ্টা না করে আমার মনে হয় সদনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ঐ বলিষ্ঠ উদার বাল্মিকীকে প্রতিষ্ঠা করলে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের সদনের আসল উদ্দেশ্যের পরিচয় চিহ্ন বহন করত। রবীন্দ্র সদনের চেকার দরজার গায়ে আয়নায় চিত্র রচনার

কুরুচিপূর্ণ প্রচেষ্টাকে সংস্কৃতির আবরণে ঢাকা যায় না। গহনার কিংবা চুলকাটার দোকানে ঢুকছি—এই অস্বাচ্ছ্যবিক অনুভূতি থেকেই যায়। এই সুযোগে আমার রবীন্দ্র সদনের অছি পরিষদের কাছে নিবেদন—একবার আবার রবীন্দ্র সদনের সাজসজ্জা নিয়ে ভাবুন। দেখুন যা আমরা করে রেখেছি তা কতটা শোভন; কতটা রুচিসম্মত, কতটা বাংলার সংস্কৃতি আস্বাদনের প্রতিনিধিত্বমূলক। আজও অনেক গুণী ব্যক্তি ঐ রাস্তার পাশ দিয়েই চলাফেরা করে থাকেন যাঁদের স্পর্শ পেলে রবীন্দ্র সদন সত্যি সত্যি একটি রবীন্দ্র সংস্কৃতির চর্চা কেন্দ্রের প্রতীক হিসাবে গ্রাহ্য হবে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা। কলকাতার বুকে অনেক মনীষীর একাধিক মূর্তি প্রায় একই ভঙ্গীতে পূর্ণ বা আবক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। আমার মনে হয় একটি মূর্তিই থাকা উচিত। সেটা হবে শিল্প সৃষ্টির একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন যাকে দেখবার জন্য মানুষ মূর্তির পাদদেশে দাঁড়াবে।

রবীন্দ্রনাথের ভাস্কর্য প্রতিকৃতির মধ্যে বর্তমানে বিতর্কিত মূর্তিটি হল প্রখ্যাত ভাস্কর রামকিংকর বেইজের। নানানভাবে



রবীন্দ্র ভাস্কর্য। শিল্পী রামকিংকর বেইজ

নানান প্রসঙ্গে এ মূর্তির স্বপক্ষে ও বিরুপতা প্রকাশ করে মানুষ তার মনের কথা জানিয়েছে। আমি মনে করি—সব সময় মানুষকে খুশী করার জন্য শিল্প না হলেও, শিল্প কখনই মানুষকে ছেড়ে নয়। আমার মনে হয় রাম-কিংকরের সৃষ্ট প্রতিকৃতিটি সেই আস্বাদন থেকে কখনই বঞ্চিত নয়।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা কিভাবে দেখে অভ্যস্ত? যেমন ঐ জোব্বা পরা তেমনই গোঁফদাড়ি সমেত একটি কবিকে। আমরা যদি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির পথ ধরে চলতে থাকি তখন কী দেখি? কেবলই কিন্তু ঐ একটি চেহারাতেই নয়। ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের সৃষ্টির আলোতেই নতুন নতুন ভাবে নতুন চেহারায় দেখে বিস্মিত হই। কর্ণ-কুন্তী সংবাদ বা কচ-দেবযানীর কথোপকথনের মুহূর্তগুলিতে কবিকে একই শরীরে দুটি মনের আকাঙ্ক্ষা ও বক্তব্য যথাযথভাবে প্রকাশে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে।

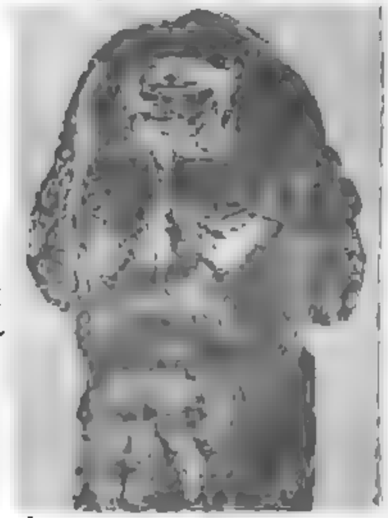
রামকিংকরের সৃষ্টি দেখে আমার মনে হয় সেখানে যাকে খুঁজে পাই, তিনি হচ্ছেন বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বলিষ্ঠ একটি ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনে মানুষের জন্য যে অনুভূতি, যে অনুরাগ তারই প্রকাশ এই মূর্তিটি। যে রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধিত্বের ধ্বনিতে বলেছেন, 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান'—এই সেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। আমরা যে মূর্তি দেখে গেল গেল, রবীন্দ্রনাথের ভাবমূর্তি নষ্ট হল, 'এ রবীন্দ্রনাথ হয়নি' বলে চিৎকার করি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাকে কী বলেছেন? তিনি যদি পছন্দ না করতেন তা হলে ভাববার বিষয় ছিল। কেউ কেউ হয়তো বলবেন কবি আঘাত দিতে চাননি শিল্পীকে। কিন্তু কবি তাঁর অপছন্দের কথা কখনো কি কোন বিষয়ে প্রকাশ করেননি? কবি যা পছন্দ করতেন না তাকে প্রত্যাখ্যান করতে সংকোচবোধ করতেন না। রবীন্দ্রনাথের এই বয়সের প্রতিমূর্তির সঙ্গে একটি ফটোর দিকে তাকাই, তাহলে এই অবয়বের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। ছবিটি আশ্রম থেকে কবির শেষ বিদায়ের মুহূর্তে পেছন থেকে তোলা। প্রত্যেক মৌলিক সৃষ্টির পেছনে শিল্পীর একটি নিজস্ব অনুভূতি কাজ করে এবং সে ক্ষেত্রে যথার্থ জাগতিক স্পষ্টতার সঙ্গে অনেক সময় মিল ঘটে না এবং তাই তা সহজেই সর্বজনগ্রাহ্য হয় না। একটি ফুল নানা জনের জীবনে নানান ভাবে ধরা দিতে পারার মতই কবি ও শিল্পীদের ধরার দৃষ্টিতে তারতম্য ঘটবে। এই রচনায় রবীন্দ্র অবয়বের মূল ছন্দটি একবারের জন্যও হারিয়ে যায়নি, অথচ তা হুবহু নয়। যে কেউ দেখলেই রবীন্দ্রনাথ—একথা বলতে বাধ্য হবেন। সেইখানেই শিল্পের মৌলিক চমৎকারিত্ব। আমরা সবাই বিদেশীদের মূর্তি তুলে ফেলার আন্দোলনে ব্যস্ত হয়েছি, কিন্তু কত সহজে রবীন্দ্রনাথকে চেনবার ও জানবার ব্যবস্থা আমরা নিজেরা করে নিয়েছি জুতোর বাক্সে, মিষ্টির ঠোঙায়, পানের মোড়কে—কারোর কিছু বলার নেই। সবাই আমরা শ্রদ্ধা জানাবার আগ্রহেই নিজের মতো করে এই অর্ঘ্য সাজিয়েছি। এই গণতন্ত্রী ব্যবস্থা কিন্তু আমাদের সব মনীষীদের ক্ষেত্রেই। এখানে কোন আন্দোলনের সোচ্চার পদক্ষেপের প্রতিধ্বনি শুনি না। তবে কি নিজের দেশে বলে?

যাঁরা সত্য সত্যই শিল্পকলা নিয়ে যুক্ত আছেন তাঁরা স্বীকার করবেনই ঐ রচনার অসাধারণ দুরন্ত ক্ষিপ্রতার গুণকে। রদাঁদের বিদেশী মূর্তিগুলি কেন আমাদের মন টানে? সে কি কেবল স্থাপত্য বলে? না তাদের অভিব্যক্তির প্রকাশ অসাধারণ বলে? যদি সে সব মূর্তির ক্ষিপ্র চলনের ব্যঞ্জনা আমাদের মুগ্ধ করে, তবে বলব রামকিংকরের করা রবীন্দ্রনাথের এই রচনা একটি সচল, বেগমান ও তীক্ষ্ণ সৃষ্টি।

দেবীপ্রসাদ, সুনীল পাল, সুধীর খাস্তগীর—এরাও রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি রচনা করেছেন। সুনীল পালের রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখী অনুভবের একটা স্পষ্ট ইংগিত লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি যেমন চিত্রিত করে ধরে বিদেশের বহু গুণী শিল্পীরা আনন্দ পেয়েছেন, তেমন সে সময় জগৎ বিখ্যাত ভাস্কররাও তাঁর প্রতিকৃতি ভাস্কর্যের মাধ্যমে ধরে রেখেছেন। এর মধ্যে আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে জ্যাকব এপস্টাইনকে। ভাস্কর্যের করণ কৌশলে সর্বগুণভূষিত এই আবক্ষ রচনাটি। এটির দিকে তাকালেই একটা বিষণ্ণ বেদনা অনুভূত হয়। মূর্তিটি কবির উজ্জল হাসিখুশি হালকা মেজাজের প্রতিফলন নয় এ এক অন্তরলোকের বিশেষ ভাবেরই প্রতিচ্ছবি।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিচ্ছবি নিয়ে আমরা সব সময় খুব বেশি চঞ্চল হয়ে পড়ি এবং



শিল্পী জ্যাকব এপস্টাইন

মূর্তির রচনাকে অবলম্বন করে উৎসাহিত হতে সময় নিই না। মূর্তির সঙ্গে প্রতিকৃতির যথাযথ মিলের ব্যবধানটুকু গ্রহণের পথ দিতে চাই না। আমরা ভুলে যাই শিল্পীর নিজে দেখার একটি বিশেষ পর্যায় আছে। সাহিত্যে সংগীতে, নাট্যে প্রত্যেক স্রষ্টারই নিজের ব্যক্তিগত রুচি দৃষ্টির ওপরে প্রকাশের ধরন অপেক্ষা করে। একই সূর্যোদয় ভিন্ন ভিন্ন মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বোধে পৌঁছে দেয়, তার উপরেই তার প্রকাশের উপায় নির্ভর করে। যদি বলি রবীন্দ্রনাথ নিজেই যখন নিজের প্রতিকৃতিকে ভেঙে চুরে গড়েছেন, সেখানে কি বলে সান্ত্বনা পাবো? সেকি কেবল কবি নিজে করেছেন বলেই? তাই কি রবীন্দ্রনাথ তাঁর মুখাবয়ব যথাযথ না হলেও সমালোচনা থেকে ক্ষমা পেলেন? ★



রবীন্দ্রনাথ লিটল ম্যাগাজিনেও লিখতেন

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কত পত্রিকায় লিখেছেন, লেখা দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর কোন বাছাবাছি ছিল কিনা—জানতে চাওয়া অস্বাভাবিক নয়। বঙ্গদর্শন, তত্ত্ববোধিনী, ভারতী, সাধনা প্রবাসী, সবুজপত্র, বিচিত্রা, শনিবারের চিঠি, কল্লোল প্রভৃতি নাম কোন সাহিত্য অনুরাগী পাঠকের ভোলার কথা নয়। আর সবকটি পত্রিকাই ছিল লিটল ম্যাগাজিন। এই পত্রিকা জগতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বনস্পতি, লেখা চেয়ে কেউ ফিরে গেছে তাঁর কাছ থেকে, এমন হয়নি। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকরা মনে করতেন রবীন্দ্রনাথকে পথ জুড়ে থাকা একজন হিসেবে, কবির অজানা ছিল না সে মনোভাব। তবু লেখা চাইতে লেখা দিয়েছেন। তাঁর কঠোর সমালোচক সুরেশ সমাজপতি 'আগমনী' নামক বার্ষিক সংকলনের জন্য লেখা চেয়েছেন, সেখানেও দিয়েছেন লেখা।

রবীন্দ্রনাথ লেখা শুরু করেছেন অল্প বয়সে। তাঁর বাল্যদশায় অবোধবন্ধু পত্রিকা (১৮৬৩), বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১) পত্রিকাই ছিল উল্লেখযোগ্য। অবোধবন্ধু প্রসঙ্গে বিহারীলাল বলেছেন, 'বাংলা ভাষায় বোধকরি এই প্রথম মাসিকপত্র---বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।' এর পরেই বাংলা-সাহিত্যে উজ্জ্বল আবির্ভাব বঙ্গদর্শনের।

দ্বাদশ বর্ষীয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা প্রকাশিত হল ১৮৭৫ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। 'অভিলাষ' নামে দীর্ঘ কবিতাটি যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হচ্ছে চন্দ্রশেখর। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী বাঙালী পাঠকদের উপহার দিচ্ছে কমলাকান্তের দপ্তর, কৃষ্ণচরিত্র। বাঙালী পাঠক এই সময়ই পরিচিত হল অন্ধ ফুলওয়ালী রজনীর সঙ্গে। এর পর হিন্দু-মেলায় বালক রবীন্দ্রনাথের পঠিত 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতাটি প্রকাশিত হয় অমৃতবাজার পত্রিকায়।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ 'প্রতিবিম্ব' নামে পত্রিকা বাংলা ১২৮২-র বৈশাখে প্রকাশ করেন। সেখানে প্রকাশিত হল 'প্রকৃতির খেদ' কবিতা। এর অব্যবহিত পরে রাজসাহী থেকে প্রকাশিত জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকা (১২৭৯) কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। প্রতিবিম্ব ও জ্ঞানাঙ্কুর একত্রিত হয়ে যায় এবং বালক কবির 'বনফুল' নামে দীর্ঘ কাব্য-উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ যখন কিশোর, ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত হল একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র 'ভারতী'। ভারতীর আয়ু প্রায় ৫০ বছরের। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা ভারতীর পাতায় প্রকাশিত হয়। মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচনা, ভিখারিণী গল্প, ভানুসিংহের কবিতা, কবি কাহিনী ছাড়াও নানা কবিতা, প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশিত হয়। তবে ভারতী ছিল ঠাকুরবাড়ির কাগজ। এবং এই পারিবারিক পত্রিকায় সিংহভাগ রসদ জোগানোর দায়িত্ব ছিল তরুণ কবির। ইংল্যান্ড যাত্রার আগের লেখা, বিলাতযাত্রীর পত্রাবলী সমস্তই ভারতীর পাতায় প্রকাশিত। দেশে ফিরে আসার পর তরুণ কবির প্রথম উপন্যাস বৌঠাকুরাণীর হাট ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় এই ভারতীতেই। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা ব্রহ্মসঙ্গীত প্রকাশিত হচ্ছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। ঠাকুরবাড়ি থেকে আর একটা কাগজ প্রকাশের পরিকল্পনা হয়েছে ইতিমধ্যে। কিশোরদের উপযুক্ত কোনো পত্রিকা নেই, তাই সত্যেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'বালক'। রবীন্দ্রনাথ বালকের জন্য সৃষ্টি করলেন 'মুকুট' গল্প, যেটি পরে 'রাজর্ষি' নাটকে রূপান্তরিত। তাছাড়া হাস্যকৌতুক, 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিও বালকের জন্য রচিত। বালক বৎসরাধিক চলেনি। এই সময়ে অফুরন্ত লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। নবজীবন, প্রচার (১২৯১) পত্রিকায় লেখা দিয়েছেন নিয়মিত। সাপ্তাহিক হিতবাদী (১২৯৮) প্রকাশিত হল। উৎসাহী রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ছয়টি গল্প। শুরু হল আরও একটি বাড়ির কাগজ—সাধনা। সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লেখার জোগানদার কাকা রবীন্দ্রনাথ। ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী, গল্প কবিতায় ভরিয়ে দিলেন সাধনাকে। তিন বছর পর সাধনার চতুর্থ বা শেষ বছরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই হলেন সম্পাদক। শিক্ষার হেরফের, পঞ্চভূতের ডায়েরী, আধুনিক সাহিত্যের প্রবন্ধগুলি সাধনার অমূল্য সম্পদ।

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় নতুন করে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব হল বাংলা সাহিত্যে কবি হলেন সম্পাদক। নৈবেদ্য'র কবিতাবলী চোখের বালি, নৌকাডুবি, স্মরণ, উৎসর্গের কবিতা প্রকাশিত হল বঙ্গদর্শনে। ৯ বছর পত্রিকার সম্পাদনা করলেন। এরই মাঝে 'নষ্টনীড়' প্রকাশিত হয়েছে ভারতী পত্রিকায়। ততদিনে এলাহাবাদ থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ করছেন 'প্রবাসী' পত্রিকা। সেখানে কবি দিলেন 'গোরা' (১৯০৭) উপন্যাসটি। নতুন করে লিখে দিলেন জীবনস্মৃতি। ছাপা হল 'অচলায়তন' নাটকটি প্রবাসীর পুজো সংখ্যায়। গোরা উপন্যাসের জন্য রামানন্দবাবু রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন ৩০০ টাকা। আসলে এই টাকাটা উনি আগেভাগে দিয়ে রেখেছিলেন এবং বলেছিলেন সুবিধেমতো সময়ে একটা গল্প লিখে দিতে। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল ৩০০ টাকার উপযুক্ত কিছু লেখা দেওয়া উচিত, তাই কলম থেকে বেরিয়ে এলো গোরা উপন্যাস। এতবড় ধারাবাহিক উপন্যাস এর আগে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। এরই ফাঁকে ফাঁকে, অজস্র পত্রিকার লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। অলকা, অঙ্কুর, উত্তরা, উপাসনা, ভূমিলক্ষ্মী, মানসী ও মর্মবাণী, মাসিক বসুমতী, মুক্তধারা, জয়শ্রী, দীপিকা, ধূমকেতু, বাঁশরী, বঙ্গবাণী, প্রাচী, প্রভাতী, শ্রীহর্ষ—আরো নানা পত্রিকায়।

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় কেদার-নাথ দাশগুপ্ত প্রকাশ করলেন 'ভাণ্ডার' (১৩১২), রবীন্দ্রনাথ হলেন তার সম্পাদক, স্বদেশী বাউল গানগুলি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাঙালীকে মাতিয়ে দিয়েছিল।

কবির জন্মদিনে, ১৩২১-এর পঁচিশে বৈশাখ শুরু হলো সবুজপত্র। সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী। প্রথম মহাযুদ্ধ আসন্ন। রবীন্দ্রনাথ এই কাগজে লিখলেন বলাকার কবিতা, চতুরঙ্গ উপন্যাস। কিছু পরে 'ঘরে বাইরে'। বাঙালী পাঠকমহল তখন বেশ আলোড়িত। এখান থেকে মুখ ফিরিয়ে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর মুখপত্র 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকা প্রকাশ করলেন। ইতিমধ্যে প্রবাসীতে প্রকাশিত হলো নতুন নাটক রক্তকরবী, ১৩৩১-এর পুজো সংখ্যায়। ১৩৩৪-এ আর একটি নতুন পত্রিকার জন্ম। নাম – বিচিত্রা, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বিচিত্রায় কবির ফসল—যোগাযোগ, দুই বোন, মালঞ্চ, পারস্য ভ্রমণ, জাভাযাত্রীর পত্র ইত্যাদি। প্রবাসীতে কিছুদিন বিরতির পর পাঠক উপহার পেল আর একটি ধারাবাহিক উপন্যাস 'শেষের কবিতা'।

চতুরঙ্গ, সমসাময়িক, সখা ও সাথী লাঙল, রূপশ্রী, রূপ ও রীতি, যুগান্তর, মোসলেম ভারত, সওগাত, ভাইবোন, বৈজয়ন্তী, শতদল, সন্দেশ, রামধনু, পরিচারিকা, প্রবর্তক, নিরুক্ত—প্রভৃতি কাগজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক লেখা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। সাময়িক পত্র বা লিটল ম্যাগাজিনকে তিনি ভালোবাসতেন, দূরে সরিয়ে দিতেন না। তাঁর বিপুল সৃষ্টির বিশাল অংশ এই সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশিত। ✱

(ঋণ স্বীকার: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)

ভি ভি ওয়াজেলকর ওয়ার

শান্তিনিকেতনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ফাঁকা মাঠের কোল ঘেঁসে গাছপালা স্নিগ্ধ ছায়ায় অরবিন্দ নিলয়। নির্জন বনবীথির কবুণাঘেরা অরবিন্দ নিলয়ের এক কোণে সংগীত সাধক ওয়াজেলকর ওয়ারের বাস ভি ভি ওয়াজেলকর ওয়ার। বাড়ি সুদূর নাগপুরে। সংগীত ভবনের শিক্ষক হিসাবে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন সেই ১৯৩৯ সালে, আর ঘরে ফেরা হলনা। শান্তিনিকেতনই তাঁর ঘর হয়ে গেছে। এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে নাগপুরেই। এক ছেলে ও এক মেয়ে শান্তিনিকেতনেই পড়াশুনা করে। ওরাও শান্তিনিকেতন ছেড়ে যেতে চায় না। বয়স হয়েছে অনেক, মনের কোণে কেমন যেন বিদায়ের সুর। বললেন—মেয়ের লেখাপড়া শেষ হয়ে গেলে দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে।

কিভাবে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন? ভীমরাও শাস্ত্রী তখন শান্তিনিকেতনের সংগীতের অধ্যাপক। বোম্বাইতে আলাপ হয়েছিল শাস্ত্রীজীর সঙ্গে। কথা প্রসঙ্গে বললেন শান্তিনিকেতন যাবেন? রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছি। এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। ১৯৩৯ সালেই শান্তিনিকেতনে ডাক পড়ল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন মনে পড়ে। বিকেল চারটে। রবীন্দ্রনাথ গান শুনতে চাইলেন। গাইলাম মূলতানী, বিলম্বিত—গোকুল গাওকে ছোড়া; আর দ্রুত —ইন দুরজন লোগ। এটুকুই মনে পড়ে।

শান্তিনিকেতনে তখন ভরা আসর। সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি সব দিকেই দিকপালেরা হাজির। সাহিত্যে প্রভাত মুখার্জি, প্রবোধ সেন; শিল্পে রামকিঙ্কর বেইজ, নন্দলাল বোস, এ পিরুমল, বিনায়ক মসোজি, সংগীতে অশেষ ব্যানার্জি, সুশীল ভঞ্জ শান্তিদেব ঘোষ, শৈলজারঞ্জন মজুমদার—একেবারে চাঁদের হাট। আর একজন ছিলেন —তবলাশিক্ষক উমাপদ ঘোষ। সোনামুখী বাড়ি।

এখন কি করে সময় কাটে? 'তালিম দিয়ে। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা আসে। সিউড়ি থেকে কেউ কেউ আসে। শেখাতে আমার বড় ভালো লাগে। সবাই খুব ভাল। আমি বেশ আছি।'

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উঠল। বললেন—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গানের সুর, বিদেশী সুর—সবই তিনি তাঁর গানে ঢুকিয়েছেন। উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্পর্কেও তাঁর ভাল জ্ঞান ছিল। সব গান তিনি সবাইকে দিয়ে গাওয়াতেন না। সাবিত্রী কৃষ্ণাণকে দিয়ে দক্ষিণ ভারতীয় সুরের গান গাওয়াতেন। ঠিক কী করলে একটি গান সর্বাঙ্গসুন্দর হবে সে সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল।'

শ্রীওয়াজেলকর ওয়ার মাত্র দুটি গান রেকর্ড করেছেন—পরিপূর্ণম আনন্দম এবং ধন্য তুমি হে পরমদেব। এঁর গুরু গোয়ালিয়রের নারায়ণ বিনায়ক পাঠক।

বললেন—'সাধনা করতে করতেই এত দিন কেটে গেল।' আটাত্তরের এপ্রিলে রিটায়ার করেছেন। 'তবু সাধনা চলবেই যত দিন না উপর থেকে ডাক আসে। লক্ষ্য হল



ভি ভি ওয়াজেলকর ওয়ার / অমিত বসু

ভক্ষ। সেই লক্ষে পৌছবার জন্য সাধনা করে যাচ্ছি। এই সুরধনটুকু সম্বল করে ভগবানেরই নাম করে যাচ্ছি।'

সাক্ষাৎকার : নির্মাল্য মল্লিক



সুবিনয় রায়

সংগীতের জগতে আকস্মিক জনপ্রিয়তার নিদর্শন ভূরি ভূরি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার স্থায়িত্ব বুদবুদের মতো। কেউ কেউ জনপ্রিয় হন দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই প্রিয়তা স্থায়ী হতে দেখা যায়। রবীন্দ্রসংগীতের জগতে সুবিনয় রায় শেষোক্ত গোষ্ঠীর শিল্পী। তাঁর জনপ্রিয়তা এসেছে দীর্ঘ দিনের শিক্ষা, সাধনা ও অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে। মার্জিত রুচির শ্রোতৃমণ্ডলীর গণ্ডি ছাড়িয়ে তাঁর নাম পৌঁছে গেছে সাধারণ শ্রোতার দরবারেও। তাঁর রেকর্ডের চাহিদাও ক্রমবর্ধমান। এই সুবিনয় রায় কিন্তু আকাশবাণীর প্রথম অডিশনে পাশ করেন আধুনিক গানের শিল্পী হিসাবে।

জন্ম ১৯২১ সালের ৮ নভেম্বর কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ পাড়ায়। বাবা বিমলাংশু প্রকাশ রায় ছিলেন কেমিস্ট। মা সুখময়ী দেবী পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের কন্যা। ছেলেবেলায় বাড়িতে প্রতিদিন উপাসনায় বসতে হত। বড় হয়ে শান্তিনিকেতনে গেলেন। সেখানে ভোর বেলায় বৈতালিক করতে যাওয়াতে তেমনি বিরক্ত লাগত। 'আজ এর মূল্য বুঝি। সব কিছুরই মূল্য বুঝতে উপযুক্ত সময় লাগে।'

মা মাসীমারা গান শিখতেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। সমাজের উৎসব অনুষ্ঠানে লেগেই থাকত গানের মহড়া। ছোট বেলায় সুবিনয় গান করতেন না। তবে মুলা মহলানবিশের বাঁশি শুনে বাঁশিতে গানের সুর তোলা রপ্ত করেছিলেন। একদিনের ঘটনা। 'মাকে গান শেখাচ্ছিলেন সুরেনবাবু। আমি পাশের ঘরে বসে নিজের মনে বাঁশিতে সুরটি তুলে নিয়েছি। হঠাৎ সুরেনবাবুর কানে বাঁশির সুর পৌঁছতেই আমার ডাক পড়ে। লজ্জায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সুরেনবাবু কিন্তু খুব খুশি। তিনি তখনই আমাকে একটা গৎ গেয়ে গেয়ে তুলে দিলেন।' বাঁশি বাজানো চলতে লাগল। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে সিটি কলেজে ভর্তি হলেন আই এসসি ক্লাসে। কিন্তু গান বাজনার দিকে ঝোঁক দেখে অভিভাবকেরা শান্তিনিকেতনে আই এসসি পড়তে পাঠিয়ে দিলেন।

কেমিস্ট্রি পড়াতেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। আবার গানের ক্লাসে তিনিই গান শেখাতেন। আস্তে আস্তে ওখানকার অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করতে লাগলেন। 'শৈলজাদাই আবিষ্কার করলেন আমি গান গাইতে পারি।' বর্ষামঙ্গলের মহড়া দিতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। পুনশ্চ আর শ্যামলী

বাড়িতে মহড়া বসত। 'রাজেশ্বরী, মোহর, অশোকবাবু, ইন্দুদি, আবদুল আহাদ, জ্যোতিষ সেন—এঁরা সব ছিলেন মহড়ায়। একটি সিন্ধী মেয়ে বিসনি জগাসিয়া ভারি ভাল গান করত। সেও ছিল।'

শান্তিনিকেতনের আনন্দের দিনগুলি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। বি এস সি পড়ার জন্য তাঁকে কলকাতায় চলে আসতে হয়। বি এস সি পাশ করার পর যখন ফলের অপেক্ষা করছিলেন সে সময়ে শান্তিনিকেতন থেকে ডাক আসে সংগীতভবনে শিক্ষকতা করার জন্য। রবীন্দ্রনাথ তখন নেই। সমরেশ চৌধুরী সে সময়ে ওখান থেকে কলকাতায় চলে এলেন। তাঁর জায়গায় সুবিনয় রায় যোগদান করলেন ঐ কাজে। 'বিবিদির (ইন্দিরা দেবী) প্রস্তাবে আমাকে এই কাজের আমন্ত্রণ জানানো হয়' এই সময় শৈলজারঞ্জন মজুমদার আর ইন্দিরা দেবীর কাছে তিনি নিয়ম করে রবীন্দ্রসংগীত শিখতেন। নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষেও গানের ভাণ্ডার পূর্ণ হতে লাগল। আশ্রমের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে একক গান করতেন। বর্ষামঙ্গলে 'গহন রাতে শ্রাবণ ধারা' গানটি গাওয়ার স্মৃতি এখনও স্পষ্ট। সংগীতভবনে তখন খুব নিয়মমাফিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না থাকলেও শৈলজারঞ্জন মজুমদারের ক্লাসে শৃঙ্খলার অভাব ছিল না। এছাড়া ভি ভি ওয়াজেল ওয়ারের কাছেও গান শেখা চলত। তখন মাসিক মাইনে পেতেন ৬০ টাকা।

বছর তিনেক শিক্ষকতা করার পর কলকাতায় চলে এলেন প্রধানত আর্থিক কারণেই। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় চাকরি নিলেন Statistical Laboratory পরে যা Indian Statistical Institute।

কলকাতায় তাঁর সংগীত শিক্ষা শুরু হল গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে। প্রায় একই সময়ে রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও তালিম নেওয়া শুরু হয়। 'গিরিজাবাবুর কাছে খুব বেশি দিন শেখার সৌভাগ্য হয়নি। আমি শেখা শুরু করার বছর খানেকের মধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রতি বৃহস্পতিবার তাঁকে দুখানি করে রবীন্দ্রনাথের গান শোনাতে হত। তিনি চোখ বুজে শুনতেন, তারপর গান শেখাতেন। আমি খুব তাড়াতাড়ি গান তুলতে পারতাম। তাই আগে উচ্চাঙ্গ সংগীত শিখিনি এ কথা উনি বিশ্বাস করতে চাইতেন না। রমেশবাবুর মত ভদ্রলোক আজকের দিনে দুর্লভ। সপ্তাহে দুদিন গান শেখাতেন, প্রথম মাসে সম্মান দক্ষিণা হিসাবে চল্লিশ টাকা দিতেই দশটাকা ফেরত দিয়ে বললেন, 'না না ত্রিশ টাকাই যথেষ্ট।' বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদ শিক্ষার ভিত্তি উনিই সুদৃঢ় করে দেন।

১৯৪৫ রেডিও অডিশানে নিয়ে গেলেন সুরেশ চক্রবর্তী। 'আমার জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া' গানটি গেয়েছিলেন। পাশ করতে পারলেন না। 'সুরেশবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন শচীনদেবের কোন গান গাইতে পারি কিনা। অক্ষমতা জানালে রবীন্দ্রনাথের হালকা চালের গান গাইতে বলেন। 'ওগো তুমি পঞ্চদশী' গানটি গেয়েছিলাম পরের বারের অডিশানে। এবং পাশ তবে আধুনিক শিল্পী হিসাবে। প্রথম অনুষ্ঠান দশ মিনিটের। সুরেশবাবুর নির্দেশে একটা আধুনিক গান 'গোধূলির ছায়া পথে' এবং রবীন্দ্রনাথের 'ঐ মালতী লতা' গানটি গেয়েছিলাম। পরের বারের কনট্রাক্ট ফরম এল রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী হিসেবেই।

১৯৪৫-এ প্রথম রেকর্ড হয় অনাদিকুমার দস্তিদারের ট্রেনিংয়ে কলম্বিয়া কোমপানিতে। 'এই করেছ ভালো নিঠুর হে' এবং 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে' গান দুটি। পরে ঐ কোমপানিতেই 'এলেম নতুন দেশে' এবং 'গোপন কথাটি রবে না' গানদুটিও অনাদি দস্তিদারের পরিচালনায় রেকর্ড হয়।

১৯৪৬ সালে বিয়ে করলেন শিশু সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ দত্তের কন্যা ইন্দিরা দত্তকে। ঐ সময়ে পঙ্কজকুমার মল্লিক সুবিনয়বাবুর ট্রেনিংয়ে 'নাই নাই ভয়' 'খর-



বায়ু বয় বেগে' 'আমার অঙ্গে' 'তিমির অবগুণ্ঠনে' গানগুলি রেকর্ড করেন। শান্তিদেব ভট্টাচার্যের কৈলাস বোস স্ট্রীটের বাড়িতে প্রতি রবিবার পঙ্কজবাবু তাঁর কাছে নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাথের গান শিখেছেন।

সংগীত শিক্ষায়তন 'গীতবিতানের' সঙ্গে উনি অনেকদিন যুক্ত ছিলেন। উত্তর কলকাতার শাখা তাঁর বাড়িতেই খোলা হয় শুভ গুহঠাকুরতার উৎসাহে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং আবদুল আহাদকে তিনিই গীতবিতানের সঙ্গে যুক্ত করেন। ১৯৫১-৫২ নাগাদ গীতবিতান ছেড়ে 'দক্ষিণী'তে যোগ দেন। ১৯৫২ সালে ইংল্যান্ডে চলে যান লাইব্রেরিয়ানশিপ পড়তে। ফিরে এসে কিছুদিন দক্ষিণীতে কাজ করার পর 'গীতবীথি' প্রতিষ্ঠা করেন। 'গীতবীথি'র প্রকাশনা বিভাগ থেকে তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীত সাধনা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩৬৯ সালের ২২ শ্রাবণ। দশ বছর পরে গ্রন্থটির পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। পরে 'গান্ধর্বী' প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার সঙ্গে যুক্ত হন।

ইতিমধ্যে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি থেকে ডাক আসায় সেখানে রেকর্ড করা শুরু করেন। 'মহে চিরন্তন' এবং 'তোমার আমায় মিলন হবে বলে' গান দুটি দিয়ে শুরু। দূরদর্শনে গান করেছেন নিয়মিত। ১৯৭৭ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছরের জন্য ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কাজ করেছেন। আর এক বছর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলো হিসাবে যুক্ত ছিলেন।

গ্রামোফোন রেকর্ডে গান করে আনন্দ পান কারণ বারবার শুধরে নেওয়া যায়। যতক্ষণ না মনোমত হচ্ছে ততক্ষণ O.K. করেন না তিনি। তবে সাধারণের সামনে বসে গাওয়ায় আনন্দের সঙ্গে কিছুরই তুলনা হয় না। রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তা অনেক বেড়েছে বলে মনে করেন।

রবীন্দ্রসংগীতের সুরে শিল্পীর স্বাধীনতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। নিজে স্বরলিপি হুবহু অনুসরণ করেন, বিশ্বাস করেন—স্বরলিপি অনুসরণ করতে জানলে তাতে প্রাণের ছোঁয়া আপনিই লাগে। রবীন্দ্রভারতীতে থাকাকালীন ছাত্রছাত্রীরা ওঁকে 'জীবন্ত স্বরলিপি' বলে অভিহিত করতেন। হারমোনিয়াম প্রসঙ্গ উঠতেই স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন এ বিষয়ে তাঁর কাছে গোঁড়ামো নেই। 'যন্ত্রতো কেবল অনুষঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হবে। গানকে দাপিয়ে না গেলেই হল। বেসুরো এস্রাজের চেয়ে সুরেলা হারমোনিয়ামই ভাল।'

'কোন গানগুলি গাইতে ভাল লাগে?'

'আলাদা করে বলা মুশকিল। তবে 'কে উঠে ডাকি' 'ওগো বধূ সুন্দরী'র মতো গান যাতে ইমাজিনেশান আছে অথবা 'কী রাগিণী বাজালে'র মত গানগুলিই আমার বেশি পছন্দ। তবে আমার গলায় ভারি তালের ও রাগ সমৃদ্ধ গানই শুনতে চান শ্রোতারা।'

গত বছর চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন, পুরোপুরি সংগীতের মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন। দুই পুত্র সুরজিত এবং সুরঞ্জন। দুজনেরই গানের প্রতিভা আছে।

বই পড়া, গান শেখানো তো আছে, তাছাড়া রেডিয়ো-র অডিশান নেওয়া, রেকর্ডের ট্রেনিং দেওয়া এই সব নানা কাজে সময় কাটে। আমির খাঁ, যশরাজ তাঁর প্রিয় গায়ক। বিলায়েত আর নিখিল ব্যানার্জির বাজনা সবচেয়ে ভালো লাগে। সমরেশ চৌধুরীর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান ছিল সব চেয়ে প্রিয়। সংগীত বিষয়ক কিছু প্রবন্ধ রচনাতেও হাত দিয়েছেন।

বেশ কিছুদিন যাবৎ রেডিওতে গান করছেন না। কারণ সম্পর্কে উনি নীরব। জানালেন—B-high থেকে A-Grade এর পরীক্ষায় দিল্লির পরীক্ষকরা তাঁকে নাকচ করেছেন। সেই কারণেই তিনি রেডিওতে গান করা বন্ধ করেছেন। মজার কথা—এই সুবিনয় রায়ই রেডিওর National Programme পরিচালনা করেছেন। তিনি Audition Board-এরও সদস্য। ★

সাক্ষাৎকার ঃ সুভাষ চৌধুরী

ঘরোয়া

ঘরোয়া আসরের জনৈক পাঠক আমার পরিচালনার কৃতিত্বের জন্য আমাকে 'Novel Prize' দিতে চেয়েছেন। সেটা কি বস্তু? একটি বাংলা বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক তাঁর নাম পরিচয়যুক্ত প্যাডে আসরে যে পত্রনিক্ষেপ করেছেন, বিশ্বাস করুন, তাতে পাঁচটি মারাত্মক অমার্জনীয় বানান ভুল রয়েছে। এবং ইংরাজি স্কুলের সমর্থনে যে ব্যক্তি আসরে ইংরাজি ভাষায় চিঠি লিখেছেন তিনি বিসমিল্লাতেই গলদ ঘটিয়েছেন 'I being a english school student' লিখে। নেসফিল্ড সাহেব তাঁর গ্রামারে স্বরবর্ণের আগে এ-র বদলে অ্যান আরটিকল প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন বলে শুনিনি। ঘরোয়া আসরের খলে থেকে এসব কোন্ বেড়াল বেরোচ্ছে?

হালফিল আমাদের ঘরোয়া কোন্দল বেশ জমে উঠেছে। ফলে ওড়িশা, আসাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও পাটনার প্রতিবেশীরা নাক গলাতে আরম্ভ করেছেন। স্বাগতম্।

এ সংখ্যায় বেশ কয়েকটি চিঠির সারবান অংশ ছেপে দিলাম। স্থানাভাবের জন্য নির্মমভাবে কাঁচি চালিয়েছি; তবু দেখুন তো, লেখাগুলো কেমন তেজী, সাহসী আর অভিজ্ঞতার রৌদ্র ছায়ায় বাহারী।

দোষ কারো নয় গো মা

ইংরাজি স্কুলে পড়া ছেলেমেয়েদের শিক্ষাগত মান বাংলা স্কুলে পড়া ছেলেমেয়েদের চেয়ে কোনো অংশেই বেশি নয়। পশ্চিমবঙ্গে যে কয়টি ভাল বাংলা স্কুল (সরকারী, বেসরকারী এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অধীনে) আছে তাতে পাঠরত এবং সেসব স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা পশ্চিমবঙ্গের নামী ইংরাজি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে শিক্ষাগত মানে যে কম নয় তাতো প্রতি বছর খবরের কাগজে প্রকাশিত স্কুল ফাইনাল (আগের হায়ার সেকেন্ডারিও) পরীক্ষার ঝাঁঝালো ফলেই দেখতে পেয়ে থাকি। আর রকে বসে যে সব ছেলেরা মেয়েদের দেখে টিটকারি দেয়, তারা সবাই বাংলা স্কুলে পড়া ছেলে একথা যেমন যুক্তিহীন, তেমনি হাস্যকর কারণ কোনো স্কুলেই (ইংরাজি অথবা বাংলা) ছাত্রছাত্রীদের বেলেল্লাপনা শিক্ষা দেওয়া হয় না। এমন দৃশ্যও দেখেছি একটি নামী ইংরাজি স্কুলে পড়া এক তরুণ সিনেমা হলে ছবি দেখতে দেখতে পাশে বসা একটি মেয়ের শরীরে যত্রতত্র হাত দিচ্ছে। তাহলে এ ব্যাপারটাকে কি বোলবো? ইংরাজি স্কুলের শিক্ষার দোষ?

এমন কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে মিশবার সুযোগ হয়েছে যারা উচ্চশিক্ষিত (ইংরাজি শিক্ষায়) এবং এসব পরিবারের অনেক ছেলে-মেয়েই ছোট থেকে নামী ইংরাজি স্কুলে পড়ে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে গেছে বা বিদেশেই চাকরি (উচ্চপদে) করছে। এইসব ছেলেমেয়েরা বাড়ি এলে মেঝেয় বসে শাক, শুক্তো, চচ্চড়ি, ঝাল বা ঝোল দিয়ে পরমতৃপ্তির সঙ্গে ভাত খায় (হাত দিয়ে, চামচ দিয়ে নয়)। গুরুজনদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, বাংলা ভাষাতেই জমিয়ে আড্ডা দেয় এবং বিদেশে ফিরে যাবার সময় আচার, বড়ি, নাড়ুও নিয়ে যায়। তাহলে এদেরকে কি বলব? অ্যাংলোচারড?

নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ি

আত্মধ্বংসের অশনিসংকেত

শিক্ষা আকাশে উৎপন্ন হয় না। শিক্ষাব্যবস্থা উৎপাদনী সম্পর্ক নির্ভর। যে দেশের অর্থনীতি আধা সামন্ততান্ত্রিক-আধা ধনতান্ত্রিক, সে দেশে পণ্য উৎপাদনের ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে, জনতার চেতনা ও রুচির বিকাশ ঘটানোর অধিকারও প্রকারান্তরে তাদের হাতেই চলে যায়। তাই অর্থনৈতিক শোষণে যদি একটা জাতিকে বধ করা যায়, তাহলে তাকে মানসিক দিক থেকেও পঙ্গু করা যায়। কারণ রুটি রুজি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চিন্তায় সে তখন এমনই পীড়িত যে সুস্থ জীবনবোধ তার

পরিচালনা শিবানী চক্রবর্তী

চেতনায় আসতে পারে না। সেই জন্যেই এদেশে ডিগ্রিধারী উচ্চশিক্ষিত কিংবা উচ্চবিত্ত এক্সিকিউটিভ চেতনা ও রুচির দিকটা নির্বীর্য থেকে যেতে পারে। আজকাল ইংরেজি স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়ানোর জন্য অভিভাবকদের মধ্যে যে একটা লালায়িতভাব ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলেছে, সেটা তাদের চেতনাশূন্যতা ও রুচিহীনতারই নির্লজ্জ প্রকাশ।

অর্থনৈতিক শোষণের ফলে পঙ্গু মানসিকতার অধিকারী শহুরে মধ্যবিত্ত আজ তার সুকুমার বৃত্তি থেকে বিয়োজিত, প্রকৃতি-পরিবেশ থেকে বিযুক্ত, আনন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন। শোষিত মানুষ অর্থনৈতিক কারণেই আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, নিঃসঙ্গ, হীনমন্য, অসহায়। এই অসহায় মানসিকতাকে ঢাকবার জন্যই মানুষ অর্থবৈভব ও স্ট্যাটাস-লালসাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। অর্থনৈতিক শোষণের নির্মম পরিণতির সাক্ষী হয়ে শহুরে মধ্যবিত্ত আজ তাই দিশেহারা হয়ে উচ্চমধ্যবিত্ত হবার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছে। গাড়ি-বাড়ি-টি ভি-ফ্রীজের মতো ইংরেজি স্কুল সম্বন্ধে মোহ এই অসহায়তারই আর একটি দিক।

শঙ্করকুমার শীল, কলকাতা ৩৭

বিকিকিনির হাট

শিক্ষা ও অর্থনীতি যে কোন সমাজের সাংস্কৃতিক মাপকাঠি। আমাদের দেশে শিক্ষা ও অর্থনীতি আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে, একে অন্যের পরিপূরক নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের শিক্ষানীতি নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় শিক্ষানীতিতে পরিবর্তন তো দূরের কথা, তাপ্পি দেওয়া ছাড়া কিছুই হয়নি। বর্তমান শিক্ষানীতি এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, নিজস্ব সংস্কৃতি বলতে আমাদের কিছুই থাকবে না বলে আমার ধারণা। দেশের শিক্ষানীতি নিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক পণ্যসামগ্রীর মত বিকিকিনি খেলা খেলে চলেছে।

একটা দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি নির্ভর করে সেই দেশের সমাজ সচেতন অর্থনীতির উপর। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করতে হলে চাই স্বনির্ভর জাতীয় অর্থনীতির দৃঢ় বুনিয়াদ। অর্থাৎ এককথায় যাকে বলে অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ। আমাদের দেশের অর্থনীতি হচ্ছে কৃষিনির্ভর। তাই গ্রামবাংলার কোণে কোণে গড়ে তুলতে হবে Agro-based Industry অর্থাৎ কৃষিনির্ভর গ্রামবাংলার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের প্রসার। এইভাবে বিকেন্দ্রীকরণের মারফৎ গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতি হলে তবেই দেশীয় শিক্ষা বিস্তার-লাভ করবে এবং তথাকথিত ইংরাজি স্কুলগুলো অচিরেই বিদায় নেবে। সব চাইতে বড় কথা, খালি পেটে ডিসিপ্লিন, স্মার্টনেসের কথা কল্পনাই করা যায় না।

বর্তমান বাংলা স্কুলগুলোর ব্যাপারে শুধু লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারি অনুদান কিংবা অবৈতনিক শিক্ষা চালু করে বাংলা স্কুলের প্রসার সম্ভব নয়। বাংলা স্কুলের বেশিরভাগ পড়ুয়ারা গ্রামবাসী। গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ছাড়া দেশি স্কুলের উন্নতিবিধান করা যাবে না। অর্থাৎ ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক ও সরকার এই চার সমাজকে শিক্ষার প্রসারে একটা সমন্বয়জনিত পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার। তবেই প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থার বনিয়াদ গড়ে উঠবে। শিক্ষা ছাড়া সুস্থ সমাজ-সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না।

সাদেক হোসেন, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ

নাগাল্যান্ডে নতুনত্ব

স্থানীয় কলেজের ছাত্র হিসাবে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তাতে বুঝতে পারছি যে ভারতবর্ষে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে উপজাতিদের মধ্যে ইংরাজির মাধ্যমে যে শিক্ষার প্রতিষ্ঠা মিশনারীদের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল আজ সেই সব উপজাতিরাও ধীরে ধীরে ইংরাজি মাধ্যম থেকে সরে যেতে শুরু করেছে এবং বেশিরভাগ উপজাতি সম্প্রদায় আপন আপন ভাষার

উদ্যোক্ত ঘটিয়ে শিক্ষায় প্রচলন শুরু করতে চেষ্টা করছে। আমাদের দেশে ইংরিজি স্কুলগুলি প্রাথমিক স্তরে যে রকম শিক্ষা দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে মাধ্যমিক স্তরে একেবারেই তা পরিলক্ষিত হয় না। তাই যদি হতো তাহলে আমরা অবশ্যই এতোদিনে কিছু সম্পদের সন্ধান পেতাম।

হরপ্রসাদ সেন, কোহিমা, নাগাল্যান্ড

মানুষ তো হইত্যাছে

'রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি'—একথা বুঝতে পেরেই মাননীয় অভিভাবক শ্রেণী তাদের পোলাপানগুলারে ইংরেজি স্কুলের দোরগোড়ায় রাইখ্যা আসত্যাছেন। ভাবখান, যেন নাইবা জ নল বাংলার 'ব', কিন্তুন ইংরাজি শিইখ্যা মানুষ তো হইত্যাছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি জানেন, নিরক্ষর কনডাকটরের সঙ্গে যখন ইংরাজি স্কুলে পড়া নয় বছরের পুঁচকে বাঙালী মেয়ে বাসের ভাড়া দেওয়ার সময় গলগল করে am আর ing'র ব্যবহারে ইংরাজি বলে তখন বেচারী কনডাকটরের অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে বড় কষ্ট হয়। ইচ্ছে করে, মেয়েটাকে কড়া বাংলায় শাসন করতে। কিন্তু মেয়ের মায়ের বব করা চুলের দিকে তাকিয়ে সংযত হই।

হতে পারে বাংলা মাধ্যমের সাধারণ স্কুলগুলোর চাইতে অসাধারণ ইংরাজি মাধ্যমের স্কুলের মান উন্নত। কিন্তু একথা কি ভেবে দেখার মত নয় যে, ১৯৪৭ আর ১৯৮০-র দীর্ঘ ব্যবধানেও বাংলা স্কুলের মান কেন উন্নত হতে পারেনি? আসলে ব্যাপারটা নিয়ে কখনই আমরা তেমন করে মাথা ঘামাইনি, আর আজও অনেকেই মাথা ঘামাতে চাননা, এই কথা ভেবে যদি কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোয় তখন 'কোন হালায় সামলাবো'?

সূর্যকুমার গুপ্ত, কলকাতা ৮

ইংরিজির সেবাদাস

ইংরাজি ভাষা ভাল। এ ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ আর বহুব্যবহৃত। তাই বলে এ ভাষা আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করবে, এ ভাষা না জানলে আমার চাকরি জুটবে না, আমার জীবন-জীবিকা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে—এ জাতীয় অসম্মান বা অপমান আমাদের বরদাস্ত করা উচিত নয়। তবু আমরা একমুঠো অন্নের দায়ে এ জাতীয় অপমান গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছি। এ অবস্থা কোন সুস্থ ও স্বাধীন সরকারেরই চলতে দেওয়া উচিত নয়। পাশাপাশি রাষ্ট্র বাংলাদেশ এই অসম্মান ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে—আজ সে দেশের নাগরিকরা শুধু মাতৃভাষার জ্ঞান নিয়েই কিন্তু অফিস-আদালত-প্রশাসনে কাজ করে যাচ্ছে মাথা উঁচু করে।

আমাদের মধ্যে একাংশ আজও মনে করেন যে, ইংরাজি গড়গড় করে বলতে ও লিখতে পারাটা বড় গৌরবের। তাদের ছেলে বা মেয়ে ইংরাজিতে লেখাপড়া, গানবাজনা-নাচ, খেলাধূলা, ভাবনা-চিন্তা করছে জানলে তাদের বুক ফুলে দশ হাত হয়। সারা দেশের ৬৫ কোটি মানুষের মধ্যে এদের সংখ্যা শতকরা দশজনও হবে কিনা সন্দেহ আছে। এরা ইংরাজির দৌলতে ভবিষ্যতে পরিণত হয় বড় বড় আমলা, উকীল, হাকিম, শিল্পপতি (উত্তরাধিকার সূত্রে) কিম্বা আরক্ষা বাহিনীর হোমড়া-চোমড়াতে। এদের সঙ্গে দেশের ৯০ ভাগ মানুষের কোন সংযোগ নাই অথচ দেশ শাসনের প্রায় সবটুকু দায়িত্বই এদের কবজায় চলে যায়। সুযোগ পেলে এরা নির্বাচিত মন্ত্রীদেরও তোয়াক্কা করে না। অবশ্যই ইংরাজি ছাড়া তৈলমর্দনও এদের বিশেষ গুণ। এদের অধিকাংশই কেউ শ্রমিক পেটাচ্ছেন, কেউ কৃষক মারছেন শাসনের নামে, কেউ শিল্পপতির মামলা লড়ে মোটা পয়সা কামাচ্ছেন। কেউ ওপরে—আরও ওপরে ওঠার প্রতিযোগিতায় মত্ত। স্বার্থান্ধ মানুষগুলো 'ইংরাজ'খাতে দেশ এবং প্রশাসন থেকে তুলে দেওয়া না যায় তার জন্যে সর্বদাই সচেষ্ট। প্রয়োজনে সক্রিয় চক্রান্ত করতেও এদের বাধে না। স্বাধীনতার আগে এরাই ইংরাজের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হিসাবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেটাতো। এরা সেই ধারা আজও অব্যাহতগতিতে চালিয়ে যাচ্ছে। এই দেশে এরাই হচ্ছে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত সুসন্তান।

কমল পাল, দুর্গাপুর ৪

এই পক্ষ

মে ১৬ থেকে ৩১

মেষ : শরীর মাঝে মাঝে উৎপাত করতে পারে। আর্থিক বিষয়ে অসুবিধে চলবে। কর্মস্থলে উর্ধ্বতন কারও সুনজরে পড়বার সম্ভাবনা। মেয়েদের কর্মস্থলে একক প্রচেষ্টায় সাফল্য। অল্পস্বল্প আয়বৃদ্ধি আশা করা যায়। পারিবারিক ক্ষেত্রে নতুন কোন সমস্যা মানসিক চাপ সৃষ্টি করবে। বন্ধুর পরামর্শ পুরোপুরি আস্থা রাখা ঠিক হবে না। স্বামী/স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের সামান্য অবনতি। কর্মপ্রার্থীদের নতুন কোন যোগাযোগের সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদের বকেয়া টাকা আদায় হতে পারে। এই লগ্নের জাতক–জাতিকার স্বজন বিরোধ।

বৃষ : স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকা যেতে পারে। আর্থিক ব্যাপারে ঝামেলা থাকবে : সঞ্চিত ধনক্ষয়। কর্মস্থলে আপাতত স্থিতাবস্থা চললেও পক্ষ শেষে নতুন কোন যোগাযোগের সম্ভাবনা। মেয়েদের কর্মস্থলে অন্য কারও প্রভাব মানসিক চাপ সৃষ্টি করবে। আয়বৃদ্ধি হতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রিয়জনের সংগে সম্পর্কের অবনতি। বাড়ি জমি-জমা ক্রয়ের সুযোগ আসতে পারে। মেয়েদের বন্ধু নির্বাচন ব্যাপারে সাবধানতা প্রয়োজন। অবিবাহিতদের বিবাহ বিষয়ে যোগাযোগ ফলপ্রসূ হতে বিলম্ব। ব্যবসায়ীদের ক্ষতি। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কর্মে সাফল্য।

মিথুন : শরীর অশান্তির কারণ হবে। সামান্য অসুস্থতাও উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। আয় ব্যয়ে সমতা না থাকলেও সামান্য সঞ্চয় আশা করা যায়। কর্মস্থলে একক প্রচেষ্টায় সাফল্য বিষয়ে আরও ধৈর্যের প্রয়োজন। মেয়েদের কর্মস্থলে নতুন যোগাযোগ। হঠাৎ কিছু অর্থ প্রাপ্তি হতে পারে। পারিবারিক পুরনো কোন বিরোধ বা সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। দাম্পত্য জীবনের খুঁটিনাটি সাময়িক অশান্তির কারণ হবে। ভ্রমণ বিষয়ে কোন ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। ব্যবসায়ীদের ঋণ। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার বন্ধু লাভ।

কর্কট : স্বাস্থ্যের উন্নতি। ব্যয়বাহুল্য চলবে ; ভালমত ঋণও হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কারও পরামর্শ সাময়িক অসুবিধায় ফেলতে পারে। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের ইংগিত। আয়-বৃদ্ধি অল্প হলেও, পক্ষ জুড়ে চলবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রিয়জনের সংগে সম্পর্কের উন্নতি হলেও পুত্র/কন্যার সংগে প্রবল মতবিরোধ। প্রেম-প্রণয় ব্যাপারে মেয়েদের হতাশা। বন্ধুদের ওপর নির্ভরতা খুব সুখের হবে না। ব্যবসায়ীদের নানা বিষয়ে বাধা, এবং ঋণ। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার অর্থনাশ।

সিংহ : শরীর ভাল চলবে না। আর্থিক ব্যাপারে অস্বাচ্ছন্দ্য, সঞ্চয় হওয়া মুশকিল। কর্মক্ষেত্রে নানান ঝামেলায় বিব্রত হবার সম্ভাবনা। মেয়েদের কর্মস্থলে বাধা, বিঘ্ন। আয়বৃদ্ধিতে বাধা। অর্থনৈতিক ব্যাপারে স্বামী/স্ত্রীর মতের অমিল। অবিবাহিত মেয়েদের প্রেম প্রণয় বিষয়ে আত্মসম্মান ক্ষুণ্ন হতে পারে। আকস্মিক ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদের মন্দাভাব কেটে যাবে। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার বন্ধু হানি।

কন্যা : স্বাস্থ্য ভংগের আশংকা। আর্থিক ব্যাপারে ক্রমশ উন্নতি। কর্মস্থলে বিরুদ্ধ কেউ গোপনে ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। মেয়েদের কর্মস্থলে ঘটনাপ্রবাহ নতুন দিকে মোড় নেবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে পুরনো কোন সমস্যার অভাবনীয় সমাধান। মেয়েদের কোন বন্ধুবান্ধব বিশেষ ভাবে উপকৃত হবার সম্ভাবনা। আত্মীয়স্বজনেরা অনেক বেশি সহায়ক হবে। জমি-জমা ক্রয় বা গৃহাদি সংস্কার হতে পারে। ব্যবসায়ীদের নতুন ঝামেলা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কর্মে সাফল্য।

তুলা : স্বাস্থ্য ভাল মন্দ মিলিয়ে চলবে। আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন কোন সমস্যার দরুন ভাল রকম ঋণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন দেখা যায় না। মেয়েদের অবশ্য পক্ষ শেষে নতুন কোন সুযোগ আসতে পারে। মাঝে মাঝে ভালরকম আয়বৃদ্ধি আশা করা যায়। অবিবাহিতদের বিবাহ ব্যাপারে ভেবে চিন্তে মতামত দেওয়া উচিত। নতুন বন্ধুদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার। ব্যবসায়ীদের মন্দা চলবে। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার হঠাৎ অর্থনাশ।

বৃশ্চিক : স্বাস্থ্যহানির আশংকা। তবে পুরনো রোগের সত্বর উপশম। আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন শুভ যোগাযোগ। কর্মক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলে লাভ হবে। মেয়েদের কর্মস্থলে কারও সংগে তীব্র মনান্তর। আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা উজ্জ্বল। সন্তানদের সময় অশুভ ; ভৃত্য/বন্ধুদের দ্বারা ক্ষতি। মেয়েদের কোন কোন বিষয়ে অতি প্রিয়জনকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। ব্যবসায়ীদের লাভের সম্ভাবনা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কর্মে সাফল্য।

ধনু : মাঝে মধ্যে শরীর উৎপাত করবে। আর্থিক বিষয় শুভ ; ধনসঞ্চয়ের ইংগিত। কর্মক্ষেত্রে কারও পরামর্শে কোন সমস্যার হঠাৎ সমাধান। মেয়েদের কর্মস্থলে উত্তেজনাকর পরিবেশ বিপাকে ফেলতে পারে। আয়বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য নয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজন মনোকষ্টের কারণ হবে। মেয়েদের বিশেষ কোন প্রত্যাশা পূর্ণ হতে পারে। অবিবাহিতদের বিবাহ ব্যাপারে আকস্মিক যোগাযোগ। ব্যবসায়ীদের মন্দাভাব কেটে যাবে। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার লাভ।

মকর : ছোটখাট অসুস্থতা ভাল রকম অসুবিধেয় ফেলতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্র শুভাশুভ ; ব্যয়বৃদ্ধির প্রবল যোগ. কর্মস্থলে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে বিলম্ব আয়বৃদ্ধি সহজে হবে। পারিবারিক ব্যাপারে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকলে লাভের সম্ভাবনা। সন্তানদের কারও জন্য দুশ্চিন্তা চলবে। কোন রিপুর তাড়নায় সম্মানহানি হতে পারে। ব্যবসায়ীদের বকেয়া টাকা পাবার সম্ভাবনা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কর্মপ্রাপ্তির অনুকূল যোগাযোগ।

কুম্ভ : শরীর নিয়ে মাঝে মধ্যে অশান্তি চলবে। আর্থিক ক্ষেত্র অশুভ ; প্রবল ব্যয় ও ঋণ যোগ। কর্মস্থলে স্থিতাবস্থা চললেও শত্রুরা সক্রিয় হবার দরুন মানসিক উৎকণ্ঠা চলবে। আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পারিবারিক ক্ষেত্রে ভাই/বোনেদের সংগে সম্পর্কে চিড় ধরতে পারে। কোন মামলা মোকদ্দমা অকারণে দীর্ঘস্থায়ী হবে। কর্মপ্রার্থীদের নতুন সুযোগ এলেও তা ফলপ্রসূ হতে দেরি হবার আশংকা। ব্যবসায়ীদের নতুন বিনিয়োগে সাবধানতা প্রয়োজন। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার আর্থিক ক্ষতি।

মীন : সামান্য কোন অসুস্থতা প্রবল হয়ে দাঁড়াতে পারে। দাঁতের পীড়ায় কষ্ট পাবার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্র শুভ হলেও ব্যয়ের চাপ এড়ানো মুশকিল। কর্মক্ষেত্রে নিজ প্রাধান্য বজায় থাকলেও কোন কারণে মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হবে। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সংগে তীব্র মনান্তর। আয়-বৃদ্ধি যৎসামান্য। পারিবারিক ক্ষেত্রে নতুন কোন সমস্যায় বিব্রত হতে হবে। টাকাপয়সার ব্যাপারে বন্ধু-আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা। মেয়েদের আর্থিক ব্যাপারে সাফল্য। ব্যবসায়ীদের মন্দা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার লাভ।

বিনয় আচার্য

ফেডারেশন নামক প্রহসন

শাক্যদেব

চতুর্থ ফেডারেশন কাপ ফুটবল বাংলার মানসম্মানকে ধুলোয় মিশিয়েছে। জাতীয় ফুটবলের আসর কলকাতায় বসিয়ে আই এফ এ যতটা সম্মান কুড়িয়েছিল সবার কাছ থেকে, এবারে ঠিক ততটা সমালোচনারই মুখোমুখি। আর সমালোচনা যারা করছেন তাদের মোটেই যুক্তিবাদী শিবির থেকে আলাদা করা যায় না।

এটাকে কি অদূরদর্শিতা বলব? নাকি ইচ্ছাকৃত? অদূরদর্শিতা যদি হয় তাহলে আই এফ এ-র সম্পাদক অশোক ঘোষের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। সেটাই স্বাভাবিক। অথচ অতীত পর্যালোচনা করলে এ যুক্তি সহজেই অগ্রাহ্য হয়ে যায়। মাননীয় অশোক ঘোষ বহুবার বহু ক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতাকে বিভিন্ন ভাবে জাহির করেছেন। সাতাত্তরের জাতীয় ফুটবলের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতাই তার সাম্প্রতিক নিদর্শন। তাহলে? প্রতিদিন এই ফুটিফাটা গরমে দুপুর দুটোয় একটি করে ৯০ মিনিট ম্যাচ রাখা এবং তা থেকে অদ্ভুতভাবে কলকাতার তিন প্রধানের রেহাই পাওয়ার ব্যাপারটি কি ইচ্ছাকৃত? একটা না হলে অন্যটা হবেই। তাই অদূরদর্শিতার যুক্তি ধোপে না টিঁকলে ইচ্ছাকৃত অপরাধটাই ঘাড়ে বসে। এবং আমার যুক্তিতে এটাই ঠিক।

রাজনীতির রাজনারায়ণের মতো অশোক বাবুও মজার মজার যুক্তি দেখিয়েছেন। প্রথমে বলেছিলেন, কলকাতার তিন প্রধানও দুপুর দুটোয় একটা করে গ্রুপ লীগের ম্যাচ খেলতে রাজি হয়েছিল। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে খেলার তালিকা সেভাবে তৈরি হল না কেন? আত্মপক্ষ সমর্থনে অশোকবাবু এবারে একটি দারুণ কথা বললেন। বললেন, দুপুর দুটোয় বাইরের দলের খেলা থাকলে মাঠে তা দেখতে হাজির থাকবেন অল্প কিছু দর্শক। এই দশ পনের হাজার উপস্থিত ওই দর্শকদের মধ্যে রোদ সইতে না পেরে— যারা অসুস্থ হয়ে পড়বেন তাদের সংখ্যাও হবে সামান্য। এবং ইডেনের 'মিনি হাসপাতালে' যত ডাক্তার থাকবেন তাদের পক্ষে একমাত্র ওই অল্প সংখ্যক অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসাই সম্ভব। প্রথম খেলাটি কলকাতার যেকোন এক দলের থাকলে দুপুর দুটোতেই ইডেনের কূল ছাপাতো। তাতে অসুস্থ হতেন আরও অনেক লোক। এবং তাদের সামাল দেওয়ার মতো অবস্থা ইডেনের 'মিনি হাসপাতালের' নেই। সুতরাং দর্শকদের দিকে চেয়ে তাদের ভালোর জন্যেই প্রথম ম্যাচটি শুধুমাত্র বাইরের দলগুলিকে খেলতে বাধ্য করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে হাস্যকর যুক্তি। বাস্তবে দেখা গেছে মাঠের অধিকাংশ দর্শক দিনে দেড়খানা করে ম্যাচ দেখেছেন। তিরিশ চল্লিশ হাজার লোক প্রতিদিনই দেখেছেন পৌনে দু'খানা করে ম্যাচ। বাদবাকি সবাই দু'টি ম্যাচই দেখেছেন, রোদ উপেক্ষা করে। ক্রিকেট মাঠের মতোই দেখা গেছে টুপির আধিক্য, সঙ্গে তোয়ালে ও ওয়াটার বটল। এসবের একমাত্র কারণ হল বাইরের দলগুলি কেমন খেলে তা চর্মচক্ষে দেখা। আমরা এতদিন বাইরের দলগুলোর হাঁকডাক কাগজে এবং রেডিওতেই শুনে এসেছিলাম। ফেডারেশন কাপের দৌলতে এবার নিজেদের ভিটেতেই তা দেখতে পেলাম। রোদকে অজুহাত করে কলকাতার ফুটবলপ্রিয় মানুষ তাই বাইরের দলগুলির কলাকৌশল দেখা থেকে দূরে সরে থাকতে পারেননি।

কিন্তু ঠা-ঠা রোদ শরীরে মেখে আমরা কী দেখলাম? এলোপাথাড়ি বল মারা, মিনিটে মিনিটে মাঠে পড়ে গিয়ে সময় চুরি করা, সেই সুযোগে সাইড লাইনের ধারের সতীর্থদের সহায়তায় জল খাওয়া ও বরফের কুচি মাথায়, জারসির ভেতরে ঢোকানো এবং কোনওরকমে সময় কাটানো ফুটবল। বিক্ষিপ্তভাবে ছাড়া কখনই বাইরের ফুটবলারদের মান এদেশের মাপকাঠি অনুযায়ী উঁচুতে

খেলাধুলা

উঠতে পারেনি। এবং তার একমাত্র কারণই হল এপ্রিলের গনগনে সূর্য।

অথচ ফেডারেশন কাপের উদ্দেশ্যই নাকি সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় ফুটবলের মান উন্নয়ন করা। সেকথা মনে রেখেই জাতীয় সাবজুনিয়র ফুটবলের আসরও এই একই সময় কলকাতায় জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। ছোটরা যাতে বড়দের খেলা দেখে কিছু শিখতে পারে। কী শিখল দেশের ছোটরা?

খেলার তালিকা এবং সময়সূচী দেখে দুপুর দুটোর খেলা সবকটি দলই কমবেশি ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সংবাদপত্রগুলির কাছে মুখও খুলেছিল তারা। জে সি টি তো বলেই বসেছিল, দুটো ম্যাচ যখন দুপুর দুটোয় খেলতে হচ্ছে তখন বাকি ম্যাচটিও তারা দুটোর সময়ই খেলবে। আই এফ এ কারোর কথাই কানে নেয়নি। শুধু বলেছে, এ সময় তালিকার পরিবর্তন সম্ভব নয়।

সেটা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু আগে থেকে কি কিছুই করা যেতনা? সকালে ফুটবল,ফুটবলের চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায়না। আই এফ এ সকালে একটা করে ম্যাচ দিতে চেয়েছিল। রাজি- হয়নি পুলিশ বাহিনী। সুতরাং আই এফ এর ভাষা অনুযায়ী বেলা দুটোয় ম্যাচ রাখা ছাড়া উপায় ছিল না।

উপায় কিন্তু ছিল। চেষ্টা এবং ইচ্ছে থাকলে অনেক কিছুই করা যায়। তিন প্রধানের খেলা প্রতিদিন বিকেলে ইডেনে রেখে অপর খেলাটি মোহনবাগান মাঠে করা যেত স্বচ্ছন্দে। আই এফ এর কথা অনুযায়ী ওই সময় মোহনবাগান মাঠ বেটন কাপের জন্য বুকড ছিল। মেনে নিলাম কথাটা ঠিক। কিন্তু কলকাতায় ঘেরা মাঠ তো তিনটি। মোহনবাগান মাঠ ছাড়া বেটনের খেলা অন্য দুটির যেকোন একটি মাঠে চেষ্টা করে কি অনুষ্ঠিত করা যেত না? কিংবা ফেডারেশনের একটি খেলা বাকি দুটি মাঠের কোনও একটিতে?

আসলে আই এফ এ কোনরকম রিসকই নিতে চায়নি। বিশেষ করে টাকার। গোড়াতেই তাই সিজন টিকিট করে ঝামেলা এড়াতে চেয়েছে। ফলে টিকিট কেটে খেলার জন্যই বেশ কিছু অপ্রধান খেলায় মাঠে দর্শকেরা হাজির হয়েছেন নিতান্ত বাধ্য হয়ে।

অর্থকরী সংক্রান্ত প্রশ্নে ঝুঁকি নিতে অবশ্য কোনও সংগঠনই চায় না। কিন্তু উপায় এখানেও ছিল। যেমন, কলকাতার তিন প্রধানের গ্রুপ লীগের নটি খেলা, ডবল লেগের দুটি সেমিফাইনালের চারটি খেলা এবং ফাইনাল, যে কটি প্রতিদিন বিকেলে অনায়াসে ইডেনে অনুষ্ঠিত করা যেত, তার জন্য একটা সিজন টিকিটের বরাদ্দ করার অসুবিধে ছিল না। বাইরের দলগুলির খেলা দৈনিক টিকিটের মাধ্যমে কলকাতার অন্য যে কোনও ঘেরা মাঠ বা রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হত। এটা করলেও আই এফ এর ভাঁড়ার কিন্তু খালি থাকত না। কারণ কলকাতা এমনই একটি শহর যেখানে ফুটবলের জন্য অন্তত কোনও কিছুই পড়ে থাকে না।

অবশ্য অনেক অভিযোগ এবং তালিকার অব্যবস্থা সত্ত্বেও ফেডারেশন কাপের খেলা তরতরিয়ে এগিয়ে গেছে। এর জন্য সবচেয়ে বেশি বাহবা যদি কারো প্রাপ্য হয় তাহলে ভাগাভাগি করে তা দিতে হবে বাইরের দলগুলিকে। চরম কষ্টের মধ্যেও দুপুর দুটোয় মাঠে নেমে যেভাবে নব্বই মিনিট তারা ছুটোছুটি করে গেছেন তাতে বাহবা তাদেরই প্রাপ্য বটে। যেকোন প্রতিযোগিতার মূল মন্ত্রই হচ্ছে অংশ গ্রহণ করা। হারজিতটা সেখানে গৌণ। বাইরের দলগুলি যে সেটি ব্যাহত হতে দেননি তার জন্য তারা ধন্যবাদার্হ। কিন্তু যদি এমন হত, দুটোয় খেলার অভিজ্ঞতার পর বাইরের সবকটি দল যদি এককাট্টা হয়ে হয়ে আই এফ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করত? যদি বিমাতৃসুলভ মনোভাবের প্রতিবাদে তিনপ্রধান ছাড়া বাকি তেরটি দলই প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিত? তাহলে? আই এফ এ তখন কী করতেন? ভাবনাটা যে বাইরের দলগুলি একসঙ্গে ভাবেননি সেটাই মঙ্গল। তাহলে কী হত বলা মুশকিল! ★

সংস্কৃতি-সংবাদ

মুকুলিকার রবীন্দ্র-প্রভাত

২০ এপ্রিল সকালে রবীন্দ্রসদনে 'মুকুলিকা' নিবেদন করলেন রবীন্দ্র সংগীতের আসর। স্মারক পত্রিকা থেকে জানা গেল—ছোট ছেলেমেয়েদের নৃত্যগীতে অনুপ্রাণিত করার জন্যই সংস্থার জন্ম। অনুষ্ঠানের প্রথম শিল্পী ছিলেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী মঞ্জু চৌধুরী। পরবর্তী শিল্পী তালিকায় ছিলেন শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র।

ছোট ছেলেমেয়েদের অনুপ্রাণিত করার বিষয়টি ঝাপসা থেকে যায় যদি না ধরে নেওয়া যায় শ্রীমতী চৌধুরীর মতো নতুন শিল্পীর গান শুনেই ছোটদের 'অনুপ্রাণিত' হতে হবে। কিন্তু এই ধরনের অনুপ্রেরণায় ক্ষেত্রেও বিশেষ ভরসা রাখা যায় কি? শিল্পীর গান তার সপ্তকে অস্বচ্ছন্দ, হারমোনিয়ামের প্রতি বড়ো বেশি নির্ভরশীল। তা ছাড়া অর্ধেক কলি গেয়ে বাকি অংশ হারমোনিয়মে বাজিয়ে ভরাট করা বা হঠাৎ গান থামিয়ে যন্ত্রসংগীতের আসর বসানো—শুধু শ্রুতিকটুই নয়, শিক্ষার্থীদের পক্ষে এর প্রভাবও অস্বাস্থ্যকর।

শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'শুভ্র প্রভাতে' শুভ সূচনার যোজনা করেছিল। বহুশ্রুত 'বঁধু মিছে রাগ কোরো না' বা 'আপনহারা মাতোয়ারা' অথবা 'নয়ন মেলে' ইত্যাদি গানগুলি তাঁর অসাধারণ কণ্ঠমাধুর্যে নতুন করে শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছিল। তবু কৌতূহল—কেন এই পুনরুক্তি? তাঁর মতো প্রবীণ শিল্পী যদি আরও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার খুলে নতুন গানের সঙ্গে পরিচিতি না করান তবে নবীন শিল্পীদের প্রতি বোধ হয় একরকম অবিচারই করা হয়।

শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র পূর্বাংশের সব অপূর্ণতা ভেঙে দেন গান নির্বাচন ও বলিষ্ঠ পরিবেশনে। যুগপৎ শিক্ষার্থীদের কাছে যা শিক্ষণীয় ও শ্রোতাদের কাছে আনন্দের উৎস। 'অন্ধজনে দেহ আলো'তে তাঁর কণ্ঠের মিনতি শ্রোতাদের অভিভূত করে, আবার 'বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া' বা 'নাই রস নাই'তে প্রার্থিত সৌন্দর্যের সন্ধান মেলে। পুষ্প-প্রভাবিত ও সহজ গানের প্রতি বরাবরই তাঁর বিশেষ ঝোঁক। তার নজির পাওয়া গেল 'সার্থক করো সাধন' বা 'ওরে ভাই মিথ্যা ভেবো না'র মাধ্যমে। জনগণেশের প্রবল অনুরোধে গাইলেন 'কৃষ্ণকলি'। 'ধানের খেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ' কলিটি গাইবার মুহূর্তেই মূর্ত হয়ে ওঠে দৃশ্যটি। তিনি প্রমাণ করেন সঠিক ও বলিষ্ঠ উচ্চারণ ও অনুভূতির প্রকাশ অপরিহার্য।

তবু প্রশ্ন : দুই শিল্পীর কণ্ঠে এতগুলি ভালো গান শোনার পরেও উদ্যোক্তাদের মূল উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছে?

শ্রীনন্দা চৌধুরী



সুচিত্রা মিত্র/সুবীর চ্যাটার্জি



অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়/ সুবীর চ্যাটার্জি

ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদের রজত জয়ন্তী উৎসব

কলকাতার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংস্থা ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদ পঁচিশ বছরে পা দিল। সাংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এঁরা নগর-জীবনে বিভিন্ন অবদান রেখে রাখতে পেরেছেন তা দর্শকবৃন্দের সপ্রশংস উপস্থিতিতেই বোঝা যায়।

২৬ এপ্রিল সন্ধ্যায় কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি তাঁদের রজত জয়ন্তী বর্ষ পালন করলেন। সংগঠনের অধ্যক্ষ হরিপ্রসাদ মহেশ্বরী তাঁর ভাষণে ভারতীয় সংস্কৃতি জীবনের মূল মন্ত্রটি শ্রোতাদের বুঝিয়ে বলেন।

সভা শেষে শুরু হয় নৃত্যনাটিকা 'রজত গুঞ্জন'। রজত গুঞ্জনের পরিচালক আনন্দশংকর। নৃত্যে অংশ নেন তনুশ্রীশংকর। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে সংগঠনের অন্যতম কর্মসচিব শ্রীমতী সুশীলা কেজরীওয়াল 'রজত গুঞ্জনে'র মূল বক্তব্য শ্রোতাদের কাছে বর্ণনা করেন।

আনন্দশংকর রজতগুঞ্জনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীতের এবং সেই সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এখানেই এ নৃত্যনাটিকার পূর্ণতা।

নৃত্যনাটিকায় বাদকবৃন্দের মঞ্চোপরি উপস্থিতি, তাদের পোশাক ব্যবহার, আলোর মায়াখেলা এবং তনুশ্রীশংকরের নৃত্য সব মিলিয়ে সেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিলনভূমিকেই এক মহিমায় তুলে ধরতে পেরেছে। বিশেষত ছন্দ সুষমা ও নৃত্য ভঙ্গিমা বুঝিয়ে দেয় আনন্দশংকর এবং তনুশ্রীশংকর উভয়েই আরও বৃহত্তর সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত হবার যোগ্য।

যীশু চৌধুরী

নাট্য-সমীক্ষা

ঝড়ের কাছাকাছি

প্রযোজনা : সৌনক। রচনা : মনোরঞ্জন বিশ্বাস। সম্পাদনা : শংকর ভাদুড়ি। প্রয়োগ ও পরিকল্পনা : জীমূতবাহন। শব্দ ও আলো : মেলো ইলেকট্রিক। মঞ্চ ও সাজসজ্জা : অমিত বিশ্বাস। অভিনয় : ৫ এপ্রিল '৮০, রবীন্দ্রভবন, শ্রীরামপুর।

এক বিরক্তিকর কিন্তু অভিনব কারণে নাটক শুরু হতে দেরি হয়, যার জন্যে বিন্দুমাত্র দায়ী ছিলেন না নাট্যদল। নির্ধারিত সময়ে দেখা গেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাত্র কয়েকজন দর্শক। আধঘণ্টা পরে অবশ্য সব আসনই পূর্ণ। শ্রীরামপুর কলকাতা থেকে খুব একটা দূর নয়, তবে সেখানেও যে নাট্যদলের এ ধরনের মফস্বলী অসুবিধার সামনে পড়তে হয় এটা জানা গেল। নাটক শুরুর দের পরে টর্চের আলোয় চেয়ার খুঁজে বসে যারা পাশের দর্শককে, 'কখন শুরু হলো, বুড়ো লোকটা কে, মেয়েটা কি আগের সিনেও ছিলো' ইত্যাদি প্রশ্ন করেন, তারা আর যাই হোন গ্রুপ থিয়েটারের দর্শক নন।' শ্রীরামপুরের মতো শহরে এই দর্শকরাই সংখ্যাগুরু—এটা লজ্জার।

চার ভাইকে নিয়ে নাটক। সে সংসারের কাণ্ডারী বড়ভাই দাদু বুকে করে মানুষ করেছে ভাইদের, বিয়ে দিয়েছে বোনের। কাটা-ফুটো সংসার জোড়াতালি দিয়ে স্বপ্নের মতো করে তুলতে চাই সে। কিন্তু হাজার সমস্যা তাদের। পারিবারিক সে সংকট থেকে মুক্তির উপায় রাজনৈতিক বিশ্বাসে। উগ্রপন্থী ছোট ভাই বাসু পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর অনুপ্রাণিত করে যায় সকলকে।

নাটকে ঘটনার বিন্যাস সংযত, স্বাভাবিক। রাজনীতি-নির্ভর এ নাটকে শব্দের ইংগিত দেওয়া হয়েছে ব ক্ত নয়, ঘটনায়। ঘটনার স্বাভাবিকতায় স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে মধ্যবিত্ত মানসিকতা, রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ইত্যাদি।

ভালো লেগেছে বাসুর ভূমিকায় শুভব্রত সেনগুপ্ত, দীপার ভূমিকায় মালা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দাদু (বাসুদেব কাঙার), শ্যামদা (লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়), পুলিশ অফিসার (মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়) যথাযথ অভিনয় করেছেন। ছোট একটি চরিত্র সুনীল সরকারের ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেছেন সুহাস মুখোপাধ্যায়। মজুর ভূমিকায় তনু দাশগুপ্তের মধ্যে ঈষৎ অতি-অভিনয়ের ছোঁয়া ছিল।

মঞ্চসজ্জা নিয়ে আপত্তি আছে। মনেই হয়নি নিম্ন মধ্যবিত্ত চার ভাইয়ের ঘর বলে, বরং সচ্ছল ড্রইংরুম বলেই মনে হয়েছে। আর…আর কমিউনিস্ট রাজনীতিতে নিবেদিত দীপার মুখে অতো রং কেন?

মৃদুল দাশগুপ্ত

চলো সাগরে

প্রযোজনা : শিল্পী সংসদ (জলপাইগুড়ি)। রচনা : বিজন ভট্টাচার্য। আলো : দেবেশ দাস। রূপসজ্জা : গুণী দাস। আবহ সংগীত : সুশ্রী। সংগীত : শ্যামল ঘোষাল। পরিচালনা, নির্দেশনা, মঞ্চ : সত্যজিৎ রায়। অভিনয় : ১১ এপ্রিল ১৯৮০, রবীন্দ্রভবন, জলপাইগুড়ি।

বিজন ভট্টাচার্যের 'চলো সাগরে'-র বক্তব্য আজকের দিনে নতুন মনে হয় না। এ নাটকে খানিকটা স্যাটায়ারের মধ্য দিয়ে বিজনবাবু ভারত ভাগ ও তারপরের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ও অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন। গোটা ব্যাপারটা বিবৃত হয়েছে এক মেঠো বাজীকর ও তার সাকরেদের খেলার মধ্য দিয়ে। ওস্তাদ তার সাকরেদকে মন্ত্রপূত জল ও যাদুদণ্ডের সাহায্যে অজ্ঞান করে দেয়, তারপর ম্যাগনেটের সাহায্যে নিয়ে আসে তার আত্মা। ওস্তাদের খেলা তখন সাসপেন্সের তুঙ্গে ওঠে। আত্মার পরিচয় আমরা পাই। তার মুখে শুনি মার্কসীয় দর্শন। সেই যুবা নিহত হয়েছিল সেই অস্থির ডামাডোলের বাজারে—তার বাবারই হাতে ছুরিকার ঘায়ে। ওস্তাদ যখন জল ছিটিয়ে তার সাকরেদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনে, তখন সে বলে—'আমি জিন্দামুর্দা আছি'। আত্মা যখন ওস্তাদের কাছে জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দেয়—এবার পথ কি হবে? ওস্তাদের সহাস্য বাস্তবিক জবাব—সে কোথা দাঁড়িয়ে বলবে।

ওস্তাদের ভূমিকায় নির্দেশক সত্যজিৎ রায় একাই একশো। আর কেউ মনে রাখার মত অভিনয় করেননি। ছোটখাটো কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করেছেন—হরকুমার দত্ত, কুমকুম গুহরায়, ভক্তা চক্রবর্তী, বাদল কর প্রমুখ। আলোকসম্পাত, মঞ্চসজ্জা যথাযথ। মাইক বিরক্তি ঘটিয়েছে। সুশান্ত নিয়োগী

মুদ্রাকর ও প্রকাশক অরুণকুমার পাল কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩, (ফোন ২৪-৫৫২০), থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২, (ফোন ২৭-৩৩১৬, ২৭-২১৬৯) থেকে প্রকাশিত

দস্যু মোহন ২

মূল কাহিনী : শশধর দত্ত ◈ চিত্র কাহিনী : অলোক দত্ত
শিল্পী : পোলারিস



PARIBARTAN, 16 May 1980. Registration No 32815/78, Postal Registration No. WB/CC—380. Rs. 1.50



আলোকচিত্র ঃ দিলীপ ব্যানারজি